ইউনিট ১

ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

Introduction to Brand Management

ভূমিকা

ব্র্যান্ড কথাটির সাথে আমারা কমবেশি সবাই মোটামুটি পরিচিত। কিছুদিন আগেও ব্র্যান্ড নিয়ে মানুষ এতো সচেতন ছিল না। বর্তমানে শিল্প পণ্য, ভোগ পণ্য বা সেবা পণ্যের সাথে অনেক বিষয় নিয়ে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে। সনাতন পণ্যসমূহ যেমন- চাল, ডাল, আটা, লবন ইত্যাদি পণ্যসমূহের ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি দুটো রেস্তোরায়ঁ একই পণ্য বা খাবার দুই রকম দামে বিক্রি হচ্ছে। এক দোকানের চাইতে অন্য দোকানে পণ্যের দাম দ্বিগুণ, তারপরও মানুষ বেশি দাম দিয়ে পণ্যটি ক্রয় করছে। কেন মানুষ বেশি দাম দিয়ে পণ্যটি কিনছে, এর যথাযথ উত্তর হলো ব্র্যান্ড। একটা পণ্যের ব্র্যান্ড ইক্যুইটি বেশি বলে মানুষ বেশি দাম দিয়ে পণ্যটি কিনছে। ভোক্তার ব্র্যান্ডকে পণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মনে করে এবং ব্র্যান্ড ইমেজের কারণেই ভোক্তারা পণ্যটি ক্রয় করে। ব্র্যান্ডের গুরুত্বের কারণে প্রতিষ্ঠানে ব্র্যান্ডকে সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

এ ইউনিটে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটে মোট আটটি পাঠ রয়েছে। প্রথম পাঠে ব্র্যান্ড কী, ব্র্যান্ডিং কী, ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং ব্র্যান্ড সম্পর্কিত কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে পণ্য কী, পণ্যের স্তরসমূহ, ব্র্যান্ড ও পণ্যের পার্থক্য এবং ব্র্যান্ড নামের ধারণাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় পাঠে ব্র্যান্ডিংয়ের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পাঠে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম পাঠে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা কী, ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার পরিধি ও কার্যাবলি এবং বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। ষষ্ঠ পাঠে ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সপ্তম পাঠে ব্র্যান্ডের আওতা ও পরিসীমা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম পাঠে ব্র্যান্ড লয়্যালটি কী, ব্র্যান্ড লয়্যালটির প্রকারভেদ ও গুরুত্বের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : ব্র্যান্ডের ধারণা
পাঠ-১.২ : পণ্য বনাম ব্র্যান্ড
পাঠ-১.৩ : ব্র্যান্ডিংয়ের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-১.৪ : ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব
পাঠ-১.৫ : ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা
পাঠ-১.৬ : ব্র্যান্ডের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
পাঠ-১.৭ : সবকিছু কী ব্র্যান্ড করা যায়
পাঠ-১.৮ : ব্র্যান্ড লয়্যালটি

পাঠ-১.১ ব্র্যান্ডের ধারণা
Brand Concept

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ড কী তা বলতে পারবেন;
- ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ডিং কী তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ব্র্যান্ড সম্পর্কিত কতিপয় ধারণার বিবরণ দিতে পারবেন।

ব্র্যান্ড শব্দটির সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। বর্তমান বিপণনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্র্যান্ড। একটি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রচার প্রচারণার জন্য যে ইউনিক চিহ্ন, নকশা, নাম, প্রতীক, ডিজাইন, লোগো ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের পণ্যকে অন্য পণ্য থেকে আলাদা করে তাকে ব্র্যান্ড বলা হয়। এটা একটি বিপণন কৌশল যার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির পণ্যগুলোকে গ্রাহকদের সামনে তুলে ধরা হয়। আমাদের হাতের কাছে পরিচিত কিছু ব্র্যান্ডের কথা বলতে পারি, যেমন- স্যামস্যাং, টেকনো, ওয়ালটন, ইজি, সনি ইত্যাদি। ব্র্যান্ড এবং ব্র্যান্ডিংকে অনেক সময় একই বিষয় মনে হতে পারে। তবে এদের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। আসলে ব্র্যান্ডিং হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্র্যান্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্র্যান্ডিং একটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে গ্রাহকদের পণ্য ক্রয়ের প্রবণতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানে মানুষের কাজ করার আগ্রহ বেড়ে যায়। একটি প্রতিষ্ঠান সুকৌশলে নিজেদের পণ্যের পার্থক্যমূলক বিষয়গুলি তুলে ধরে সমজাতীয় পণ্যের বিপরীতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে।

ব্র্যান্ড কী?
What is a Brand?

ব্র্যান্ড শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। প্রতিনিয়ত আমরা বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের নাম দেখতে পাই। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অনেক পণ্যের নাম শুনে থাকি। একই পণ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে উৎপাদন করছে। একটি কোম্পানি যে নাম, প্রতীক, ডিজাইন, লোগো, চিহ্ন বা নকশা ব্যবহার করে তার পণ্যকে অন্যদের পণ্য থেকে পৃথক করে তাকে ব্র্যান্ড বলা হয়। পৃথিবীতে অনেক প্রতিষ্ঠান ঘড়ি উৎপাদন করে। তবে যখন আমরা সিকো ঘড়ির কথা বলি তখন এটা জাপানের একটি ঘড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়। ফলে ঘড়ির বাজারে সিকো একটি বিশেষ ব্র্যান্ড। এছাড়াও বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ঘড়ি দেখতে পাওয়া যায় যেমন— রোলেক্স, ওসাকা, ক্যাসিও, ওমেগা, টাইটান, মাইকেল কোরস, ফাস্ট্র্যাক, নেডিফোর্স ইত্যাদি। এই ঘড়িগুলো আলাদা আলাদা ব্র্যান্ডের মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিচিত।

American Marketing Association এর মতে, "A brand is a name, term, sign, symbol, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors." অর্থাৎ, ব্র্যান্ড হলো একটি নাম পরিভাষা, চিহ্ন, প্রতীক, ডিজাইন বা এগুলোর একটা সংমিশ্রণ যা কোনো বিক্রেতা বা বিক্রেতাদলের পণ্য বা সেবাকে স্বতন্ত্রভাবে বা প্রতিযোগী পণ্য থেকে পৃথক করার লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়।

Henry Assael বলেন, "Brand is a name or symbol that represents a product." অর্থাৎ, পণ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি নাম অথবা প্রতীককে ব্র্যান্ড বলে।

বিভিন্ন লেখকগণ ব্র্যান্ডিংয়ের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে মূল কথা হলো ব্র্যান্ড বলতে এমন কোন নাম, প্রতীক, ডিজাইন বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা একজন বিক্রেতার পণ্য বা সেবাকে অন্যান্য বিক্রেতার পণ্য বা সেবা থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করে। ভোক্তারা ব্র্যান্ডকে পণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। অনেক ক্ষেত্রে ভোক্তারা ব্র্যান্ড ইমেজের কারণে পণ্য বা সেবা ক্রয় করে এবং অন্যকে উক্ত পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করে।

ব্র্যান্ডের কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

Brand is a name or symbol that represent a product (Henry Assael). অর্থাৎ, পণ্যকে প্রতিনিধিত্বকারী নাম বা প্রতীককে ব্র্যান্ড বলে।

Brand is a name, term, design, symbol, or any other features that identifies one seller's goods or services as distinct from those of other sellers. (Steven J. Skinner) অর্থাৎ, ব্র্যান্ড হলো নাম, শর্ত, ডিজাইন, প্রতীক বা একজন বিক্রেতার সেবা চিহ্নিত করার জন্য যে কোন বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য বিক্রেতাদের থেকে আলাদা করা যায়।

Brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of those, that identifies the maker or seller of a product or service (Philip Kotler & Garg Armstrong). অর্থাৎ, পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা পণ্য বা সেবা চিহ্নিত করার জন্য যে সকল নাম, শর্ত, সংকেত, প্রতীক, নকশা অথবা এগুলোর মিশ্রণকে ব্যবহার করে তাকে ব্র্যান্ড বলে।

Brand is a name, term, symbol, design or combination of these that identifies a seller's products and differentiates them from competitors products (Pride & Ferrell) অর্থাৎ, ব্র্যান্ড হচ্ছে একটি নাম, পদ, প্রতীক, নকশা বা এসবের সমন্বয় যা একজন বিক্রেতার পণ্যকে শনাক্ত করে এবং প্রতিযোগীদের পণ্য থেকে পৃথক করে।

সার্বিক আলোচনা এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে ব্র্যান্ডের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ব্র্যান্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

১। ব্র্যান্ড হলো কোনো নাম, প্রতীক, ডিজাইন, টার্ম, চিহ্ন, শব্দ, সমষ্টি পদ বা এগুলোর সংমিশ্রণ।
২। ব্র্যান্ডের উদ্দেশ্য হলো নিজের পণ্যকে প্রতিযোগীদের পণ্য থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা।
৩। ক্রেতারা নন-ব্র্যান্ডের পণ্যের চাইতে ব্র্যান্ডের পণ্য বেশি পছন্দ করে।
৪। ক্রেতারা মনে করে ব্র্যান্ডের পণ্যের গুণগতমান অনেক বেশি।
৫। ব্র্যান্ড পণ্যকে সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করে।
৬। ব্র্যান্ডের সুনামের কারণে ক্রেতারা পণ্যের অধিক মূল্য প্রদানে ইচ্ছুক থাকে।
৭। ব্র্যান্ড পণ্যকে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে।

সার্বিক আলোচনা থেকে দেখা যায় ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনন্য পরিচয় তৈরি করে। এটি একটি প্রতিষ্ঠানকে তার প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করে তোলে এবং ব্র্যান্ডকৃত পণ্যটিকে মনে রাখতে ক্রেতাদের সাহায্য করে।

ব্র্যান্ডিং
Branding

সাধারণভাবে ব্র্যান্ড ও ব্র্যান্ডিংকে একই বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু বিপণন পাঠের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্র্যান্ড বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝে থাকি পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য বা সেবাকে চিহ্নিত করার জন্য যে সকল নাম, শর্ত, সংকেত, প্রতীক, ডিজাইন, নকশা অথবা এগুলোর সংমিশ্রণকে ব্যবহার করে। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিং হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্র্যান্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কোনো একটি পণ্য বা সেবাকে অন্য পণ্য বা সেবা থেকে পৃথক করার জন্য সংকেত, চিহ্ন, নাম, ডিজাইন, প্রতীক বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করার সাথে সম্পৃক্ত সকল কার্যাবলিকে ব্র্যান্ডিং বলা হয়। আমাদের কাছে ওয়ালটন বা স্যামসাং ব্র্যান্ডের নাম পরিচিত। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ব্র্যান্ডগুলো আমাদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। এই চলমান প্রক্রিয়াকেই ব্র্যান্ডিং বলা হয়। একটি প্রতিষ্ঠান খুব সহজেই তার পণ্যের জন্য নাম, প্রতীক বা ডিজাইন নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু এটাকে কার্যকর করার জন্য অনেক কিছু বিবেচনায় নিয়ে আসতে হয়। আবার অনেক সক্রিয় ব্র্যান্ডকেও যদি সঠিকভাবে প্রমোট করা না হয় তবে এক সময়ে ব্র্যান্ডটি তার ইমেজ সংকটে পড়বে। পৃথিবীতে এমন অনেক জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ছিল যারা আজ হারিয়ে গেছে। স্মার্ট ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যবসায়িক ও সামাজিক মূল্য তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ মাইক্রোসফট এর কথা বলা যায়। পৃথিবীর সকল মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন থাকে এ কোম্পানিতে কাজ করা। ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে ক্রেতার সাথে পণ্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়। কোন জুতোর দোকানে যদি আপনাকে ১০টি ব্র্যান্ডের জুতো দেখানো হয়, তবে বারবার আপনি আপনার পচ্ছন্দের ব্র্যান্ডের দিকেই ফিরে আসবেন। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সাফল্যের একটি বড় ও অপরিহার্য অংশ হলো ব্র্যান্ডিং।

ব্র্যান্ডিংয়ের কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলোঃ

Branding means the use of a name, term, symbol or design or a combination of these to identifying a product (McCarthy & Perreault). অর্থাৎ, একটি পণ্যকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য কোন নাম, শর্ত, চিহ্ন বা ডিজাইন ব্যবহার করাকে ব্র্যান্ডিং বলে।

Branding is the practice of giving a specified name to a product or groups of products of one seller. (Pillai & Bagavathi) অর্থাৎ, কোনো বিক্রেতার নির্দিষ্ট একটি পণ্য বা পণ্য সমষ্টির সুনির্দিষ্ট নাম প্রদানের কার্যক্রমকে ব্র্যান্ডিং বলে।

Branding refers to decisions about product names, brand marks, and trademarks. (Steven J. Skinner). অর্থাৎ, পণ্যের নাম, ব্র্যান্ড মার্ক এবং ট্রেড মার্ক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহাণকে ব্র্যান্ডিং বলে।

উপরের আলোচনা এবং সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে ব্র্যান্ডিংয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। ব্র্যান্ডিংয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে বিবৃত করা হলো:

১। ব্র্যান্ডিং হলো পণ্য কৌশলের অন্যতম হাতিয়ার;
২। ব্র্যান্ডিং হলো একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া;
৩। ব্র্যান্ডিং হলো একটি মানসিক সংযোগ তৈরি করা;
৪। ব্র্যান্ডিংয়ের লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহকের আনুগত্য তৈরি করা;
৫। ব্র্যান্ডিং হলো ইক্যুইটি তৈরির প্রক্রিয়া;
৬। ব্র্যান্ডিং এক পণ্য থেকে অন্য পণ্যের পার্থক্য সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, ক্রেতার কাছে একটি পণ্য বা সেবার ইউনিক পরিচিতি তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ব্র্যান্ডিং বলে। ব্র্যান্ডিং হলো কোনো পণ্যের নির্দিষ্ট একটা পরিচয়। ব্র্যান্ডিং হলো এক ধরনের বিপণন অনুশীলন যা পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানির সতন্ত্র নাম, লোগো, প্রতীক, ট্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করে তার সঠিক পরিচিতি তুলে ধরা।

ব্র্যান্ড সম্পর্কিত ধারণা

Brand Related Concept

ব্র্যান্ড পঠনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় বারবার আলোচনায় চলে আসে। পরিপূর্ণভাবে ব্র্যান্ড পঠনের জন্য ব্র্যান্ড সংশ্লিষ্ট কতকগুলো ভাষা সম্পর্কে ধারণা লাভ আবশ্যক। এখানে কতকগুলো শব্দের ধারণা প্রদান করা হলো:

১. ব্র্যান্ড নাম (Brand Name): ব্র্যান্ড নাম হচ্ছে এক বা একাধিক শব্দ বা বর্ণের সমষ্টি যা দ্বারা একটি নামের সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বলা যায় ব্র্যান্ডের যে অংশ উচ্চারণ করা যায় তাকে ব্র্যান্ড নাম বলে। ব্র্যান্ডকে যে নামে ডাকা হয় তাকেই ব্র্যান্ড নাম বলে। যেমন- স্কয়ার, সনি টিভি, সিঙ্গার ফ্যান, কেয়া বিউটি সোপ ইত্যাদি।

২. ব্র্যান্ড মার্ক (Brand Mark): ব্যান্ড মার্ক বা মার্কা হচ্ছে ব্র্যান্ডের সেই অংশটুকু যা দিয়ে ব্র্যান্ডকে সনাক্ত করা যায় কিন্তু উচ্চারণ করা যায় না। এগুলো প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রতীক, মনোগ্রাম, নকশা, চিহ্ন ইত্যাদি। এছাড়া ব্র্যান্ড মার্কে বিভিন্ন ধরনের রং ও শব্দগুচ্ছ থাকতে পারে। যেমন- কোডাক ফ্লিমের কৌটার উপর লাল "K" চিহ্নটি বা নাইকি জুতার মনোগ্রামে (✓) এই চিহ্নটি।

৩. ট্রেডমার্ক (Trademark): যখন কোনো পণ্যের নির্দিষ্ট নামটি ব্যবসায়িক নাম ও ব্যবসায়িক চিহ্ন আইন দ্বারা নিবন্ধিত হয় তখন তাকে ট্রেডমার্ক বলে। ট্রেডমাক দ্বারা পণ্যগুলোর উৎপাদককে ব্র্যান্ড নাম বা ব্র্যান্ড মার্ক ব্যবহারের একমাত্র অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এটি একটি আইনগত স্বীকৃতি। পণ্য নকল হলে ট্রেড মার্ক হতে আইনগত সুবিধা পাওয়া যায়।

৪. কপিরাইট (Copyright): সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের পুনরুৎপাদন এবং এর অবৈধ ব্যবহার বন্ধের জন্য যে আইনের বিধান রায়েছে তাকে কপিরাইট বলে। একজন লেখকের রচিত পুস্তক বা গ্রন্থের ওপর তার মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ ও প্রকাশের একচ্ছত্র অধিকারকেই বলা হয় কপিরাইট। কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধা সম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়।

ট্রেডমার্ক ও ব্র্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য

Difference Between Trademark and Brand

ব্র্যান্ড ও ট্রেডমার্ক উভয়ই পণ্য মোড়কের উপর ব্যবহৃত হয়। তথাপি এদের কার্যপরিধির অনেক পার্থক্য পরিলক্ষতি হয়। যখন কোনো পণ্যের নির্দিষ্ট নামটি ব্যবসায়িক নাম ও ব্যবসায়িক চিহ্ন আইনের দ্বারা নিবন্ধিত হয় তখন তাকে ট্রেডমার্ক বলে। অন্যদিকে ব্র্যান্ড হলো কোন নাম, চিহ্ন, প্রতীক বা ডিজাইন অথবা এগুলোর সংমিশ্রণ, যা ব্যবহার করে বিক্রেতা তার

পণ্য বা সেবাকে অন্যদের পণ্য বা সেবা থেকে আলাদা করে। এদের সংজ্ঞাগত পরিচয় থেকে ট্রেডমার্ক ও ব্র্যান্ডের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। ব্র্যান্ড এবং ট্রেডমার্কের পার্থক্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **সময়সীমা:** ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে সময়সীমার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। ব্র্যান্ড সৃষ্টির পর থেকে এর মেয়াদকাল প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে সময়সীমার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাধারণত একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের পর ট্রেডমার্ক নবায়ন করতে হয়। ট্রেডমার্ক নবায়ন না করলে এটি তার আইনগত বৈধতা হারায়।

২. **উদ্দেশ্য:** ব্র্যান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পণ্য পরিচিতির মাধ্যমে প্রতিযোগী পণ্যের চেয়ে নিজের পণ্যটিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা। ট্রেডমার্কের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মালিকের নিরাপত্তা বিধান করা।

৩. **ধরণ:** বিভিন্ন ধরেনর ব্র্যান্ড বাজারে প্রচলিত রয়েছে। বিপণনের আওতাভুক্ত সকল বিষয়কে ব্র্যান্ডিং করা যায়। ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ট্রেডমার্ক, সাধারণ ট্রেডমার্ক, ও সেবা ট্রেডমার্ক ইত্যাদি ধরনের ট্রেডমার্ক দেখা যায়।

৪. **ইমেজ:** ব্র্যান্ড পণ্যের ইমেজ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ট্রেডমার্ক পণ্যের ইমেজ বৃদ্ধিতে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করে না।

৫. **আইনগত দিক:** ব্র্যান্ড নকল হলে কর্তৃপক্ষ কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। ট্রেডমার্ক নকল হলে কর্তৃপক্ষ যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৬. **আওতা:** ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে সকল ব্র্যান্ডকে ট্রেডমার্ক করা যায় না বা সকল ব্র্যান্ডের ট্রেডমার্ক হয় না। কিন্তু সকল ট্রেডমার্ক হলো ব্র্যান্ড। ট্রেডমার্ক কর্তৃক পণ্যকে ব্র্যান্ড বলা হলেও সকল ব্র্যান্ড ট্রেডমার্ককৃত নয়।

৭. **ব্যবহার:** ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নাম, চিহ্ন, প্রতীক, ডিজাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে R, TM, SM এই তিনটি প্রতীক দ্বারা ট্রেডমার্কের ধরন সংজ্ঞায়িত করা যায়।

৮. **অবস্থান:** ব্র্যান্ড একটি আস্থার বিষয়। ব্র্যান্ড মানুষের মনের মধ্যে অবস্থান করে। ট্রেডমার্ক সাধারণত লোগো, প্রতীক, চিহ্ন ইত্যাদি বিষয় দ্বারা পণ্যের প্যাকেজের উপর অবস্থান করে।

৯. **স্বার্থরক্ষা:** ব্র্যান্ড প্রধানত ক্রেতার স্বার্থরক্ষা করে, তাই এটাকে ক্রেতাকেন্দ্রিক অ্যাপ্রোচ বলা হয়। ট্রেডমার্ক প্রধানত বিক্রেতার বা উৎপাদকের স্বার্থরক্ষা করে, তাই এটাকে বিক্রেতাকেন্দ্রিক অ্যাপ্রোচ বলা হয়।

১০. **আকর্ষণীয়তা:** ব্র্যান্ডের আকর্ষণীয়তা সার্বজনীন। ব্র্যান্ড বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে পণ্যের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করে। ট্রেডমার্কের কোন আকর্ষণীয়তা নেই।

১১. **কৌশল:** ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্য কৌশল গ্রহণ করা যায়। যেমন- পণ্য পৃথকীকরণ, পণ্য পজিশনিং, মূল্য বা প্রসার কৌশল। ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশল গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

১২. **উদাহরণ:** পণ্য ব্র্যান্ডের উদাহরণ, যেমন- তিব্বত সাবান, কেয়া কসমেটিকস্, লাইফবয় সাবান, সনি টেলিভিশন। অন্যদিকে গোল্ডলিফ সিগারেটের প্যাকেটের উপর দিকে CR লেখা আছে এটি ট্রেডমার্ক। CR এর অর্থ এটি নিবন্ধিত।

সারসংক্ষেপ:

ব্র্যান্ড শব্দটির সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। বর্তমান বিপণনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্র্যান্ড। একটি প্রতিষ্ঠান তার প্রচার প্রচারণার জন্য যে ইউনিক চিহ্ন, নকশা, নাম, ডিজাইন, প্রতীক, লোগো ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের পণ্যকে অন্য পণ্য থেকে আলাদা করে তাকে ব্র্যান্ড বলা হয়। যেমন- স্যামসাং, টেকনো, ওয়ালটন, ইজি, সনি ইত্যাদি। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিং হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্র্যান্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্র্যান্ডসমূহ গ্রাহকদের কাছে পরিচিতি লাভ করে। একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য অপরিহার্য অংশ হলো ব্র্যান্ডিং। ব্র্যান্ড নাম হলো এক বা একাধিক শব্দ বা বর্ণের সমষ্টি যা দ্বারা একটি নামের সৃষ্টি হয়। ব্র্যান্ড মার্ক হচ্ছে ব্র্যান্ডের সেই অংশটুকু যা দিয়ে ব্র্যান্ডকে সনাক্ত করা যায় কিন্তু উচ্চারণ করা যায় না। যখন কোন পণ্যের নির্দিষ্ট নামটি ব্যবসায়িক নাম ও ব্যবসায়িক চিহ্ন আইন দ্বারা নিবন্ধিত হয় তখন তাকে ট্রেড মার্ক বলে। সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের পুনরুৎপাদন এবং এর অবৈধ ব্যবহার রোধের জন্য যে আইনের বিধান তাকে কপিরাইট বলে।

পাঠ-১.২ পণ্য বনাব ব্র্যান্ড
Product Versus Brand

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পণ্য কী তা বলতে পারবেন;
- পণ্যের স্তরসমূহের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- পণ্য ও ব্র্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন এবং
- ব্র্যান্ড নামের ধরনসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

অনেকেই পণ্য এবং ব্র্যান্ডকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকে। বাস্তবে পণ্য ও ব্র্যান্ড দুটো আলাদা বিষয় এবং এদের মধ্যে অনেক ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য হলো মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে এমন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল বস্তু। দৃশ্যমান বস্তু যেমন- টেবিল, চেয়ার, খাতা, কলম ইত্যাদিকে যেমন পণ্য বলা যায় তেমনি অদৃশ্যমান বস্তু যেমন- ব্যাংক, বীমা, হোটেল পরিবহন ইত্যাদিকেও পণ্য বলা হয়। আবার ব্যক্তি, স্থান, ইভেন্টস্, অভিজ্ঞতা, সংগঠন, তথ্য, ধারণা ইত্যাদি এখন পণ্যের আওতায় চলে এসেছে। ফলে মানুষের উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন বিষয়সমূহ পণ্যের আওতাভূক্ত। আবার সকল পণ্যই ব্র্যান্ড নয়। কারণ একটা পণ্যকে ব্যান্ড হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করতে হলে তাকে একটি পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। ব্র্যান্ড হচ্ছে একটি নাম, প্রতীক, চিহ্ন, ডিজাইন, লোগো বা সবগুলোর সমন্বয় যা কোন বিক্রেতার পণ্য বা সেবার নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তোলে।

পণ্য বনাম ব্র্যান্ড
Product versus Brand

অনেকেই পণ্য এবং ব্র্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা চেষ্টা করে না। তারা মনে করে ব্র্যান্ড হলো পণ্যের একটা অংশ। তাই ব্র্যান্ড এবং পণ্যকে আলাদাভাবে আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে বাস্তবে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এবং এদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমেই দেখা যাক পণ্য কি? যা মানুষের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করে সাধারণভাবে তাকেই পণ্য বলা হয়। পণ্য বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যা বাজারে উপস্থিত হয়ে ভোক্তাদের প্রয়োজন ও অভাবের সন্তুষ্টি বিধান করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্যকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- উৎপাদকের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য হলো কাঁচামালের সংমিশ্রণে গঠিত বস্তু। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য হলো, বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে গঠিত বিষয় যা কোনো উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বিপনণের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য হলো, মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে এমন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল বিষয়বস্তু ।

বেশিরভাগ পণ্য বস্তুগত পণ্য হলেও সেবা, ব্যক্তি, স্থান, সংগঠন, ধারণা, তথ্য, ইভেন্ট, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পণ্য হতে পারে। দৃশ্যমান বিষয় যেমন- টেবিল, চেয়ার, চাল, ডাল ইত্যাদিকে পণ্য বলা হয়। অদৃশ্যমান বিষয় যেমন- ব্যাংক, বীমা, হোটেল, পরিবহন, চিকিৎসা ইত্যাদিকে পণ্য বলা হয়। ব্যক্তিও পণ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন- নির্বাচনের প্রার্থী বা বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জনগণের মঙ্গলের জন্য পরামর্শ প্রদান করলে এবং জনগণ ঐগুলো গ্রহণ করলে ঐ ব্যক্তি পণ্য হিসেবে গণ্য হবে। আবার ধারণাও পণ্য হতে পারে, যেমন- ধুমপানে মৃত্যু। এভাবে সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়; স্থান হিসেবে শহর, বন্দর, দেশ; ইভেন্টস হিসেবে ক্রীড়া অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সম্মেলন, প্রদর্শনী ইত্যাদি পণ্যের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা পূরণে সক্ষম সকল দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বস্তুকে পণ্য বলা যায়।

পণ্যের স্তরসমূহ
Levels of Product

কোনো পণ্যেকে বাজারে উপস্থাপনের জন্য বিপণনকারীকে পাঁচটি স্তর ভালোভাবে চিন্তা করতে হয়। একজন ক্রেতা যখন পণ্য ক্রয় করে তখন সে পণ্যের সাথে আরো কিছু গুণাবলী বিবেচনা করে। যে কারণে পণ্য পরিকল্পনা গ্রহণের সময় বিপণনকারীকে সাধারণত পণ্যের পাঁচটি স্তর গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। নিম্নে পণ্যের স্তরসমূহের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

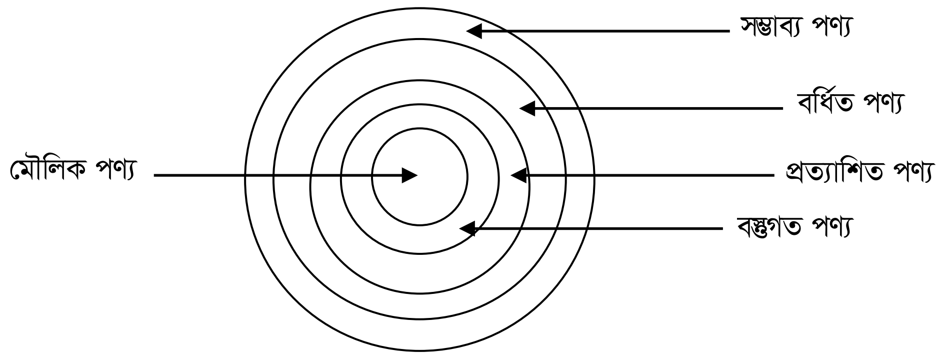

চিত্র: পণ্যের স্তরসমূহ

১. মৌলিক সুবিধা (Care Benefit): মৌলিক সুবিধা হচ্ছে পণ্যের মূল বিষয়। পণ্য পরিকল্পনার সবচেয়ে কেন্দ্রিয় স্তর হলো পণ্যের মৌলিক সুবিধা। মূলতঃ যে বিষয়টি পাওয়ার জন্য ক্রেতারা পণ্যটি ক্রয় করে তাকে মৌলিক স্তর বলে। পণ্য ক্রয়ে ক্রেতারা মূল একটি বিষয় প্রত্যাশা করে। একজন নারী যখন লিপস্টিক ক্রয় করে তখন সে প্রধানত ক্রয় করে সৌন্দর্য। হোটেলে যখন কোনো গেস্ট আসেন তখন তিনি ক্রয় করেন বিশ্রাম। আসলে এটিই ক্রেতার প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান করে থাকে। ক্রেতার পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য এই স্তরেই সফল হয়। তাই পণ্য পরিকল্পনায় বিপণনকারীকে পণ্যের মৌলিক সুবিধা চিহ্নিত করে ক্রেতাদের কাছে পণ্য উপস্থাপন করতে হবে যাতে ক্রেতারা উক্ত পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হয়।

২. বস্তুগত পণ্য (General Product): মৌলিক পণ্য বা সুবিধাকে কেন্দ্র করে পণ্যের যে অবয়ব তৈরি হয় তাকে প্রকৃত পণ্য বলে। সাধারণত পণ্যের যে অংশটুকু বাইরে থেকে মৌলিক পণ্যকে ধারণ করে রাখে এবং যা স্পর্শ বা অনুভব করা যায় সে অংশটুকু হচ্ছে বস্তুগত পণ্য। এখানে দৃশ্যমান পণ্যের বস্তুগত বিষয়সমূহ ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। বস্তুগত পণ্যের এ সকল দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো পণ্য আকৃতি, ডিজাইন, ব্র্যান্ড, মোড়ক ইত্যাদি। লিপস্টিক কেনার সময় একজন ক্রেতা এর ডিজাইন, আকৃতি, ব্র্যান্ড, রং ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে থাকেন। হোটেলে অবস্থানের সময় অতিথি বিছানা, খাট, টেবিল, তাওয়াল, বালিশ, চাদর ইত্যাদি বস্তুগত বিষয় বিবেচনা করে থাকেন। তাই বিপণনকারীকে পণ্য পরিকল্পনার সময় পণ্যের বস্তুগত দিকটি বিবেচনায় রাখতে হয়।

৩. প্রত্যাশিত পণ্য (Expected Product): এটা পণ্যের তৃতীয় স্তর। বস্তুগত পণ্য থেকে ক্রেতা যদি সন্তুষ্টি লাভ করে তবে ক্রেতা এই স্তরে প্রবেশ করে। বস্তুগত পণ্যের পাশাপাশি ক্রেতা ঐ পণ্য থেকে আরো কিছু সুবিধা বা পণ্য গুণাবলী প্রত্যাশা করে। সাধারণত প্রত্যেক ক্রেতাই পণ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রত্যাশা করে। যেমন— হোটেল কক্ষে একজন অতিথি প্রত্যাশা করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কক্ষ, পরিস্কার বিছানা, চাদর, বালিশ, টাওয়াল, টেবিল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একই সাথে সব হোটেলগুলো যখন ক্রেতাদের প্রত্যাশা পূরণ করে তখন ক্রেতারা পছন্দের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকবে এবং সেক্ষেত্রে তুলনামূলক কম খরচ বা বাড়তি সুবিধাজনক পণ্যকে গ্রহণ করবে। তাই প্রত্যেকটা উৎপাদক ক্রেতাদের ন্যূনতম প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করে।

৪. বর্ধিত পণ্য (Augmented Product): এটা পণ্যের চতুর্থ স্তর। ক্রেতাদের প্রত্যাশিত সুবিধা পূরণের পর বিক্রেতা ক্রেতাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বাড়তি আরো কিছু সুবিধা প্রদান করে। বিপণনকারী বিপণনকৃত পণ্যটির সাথে যে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে পণ্যটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে তাকে বর্ধিত পণ্য বলে। এর মাধ্যমে বিপণনকারী তার পণ্যটিকে পার্থক্যকীরণ এবং আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে। একজন হোটেল ব্যবসায়ী পণ্যকে বিভিন্নভাবে বর্ধিত করতে পারে। যেমন- হোটেল রুমে ইন্টারনেট বা ওয়াই-ফাই সুবিধা প্রদান করা, সংবাদপত্র, বা জার্নাল সরবরাহ করা, সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা ইত্যাদি। যে হোটেলগুলো একই মূল্যে বাড়তি সুযোগ সুবিধাগুলো নিশ্চিত করছে ক্রেতাগণ সে হোটেলগুলোর প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করবে। বর্তমানে এই বর্ধিত সেবা নিয়েই তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। সচেতন ক্রেতারা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্ধিত সেবাসমূহ সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছে।

৫. সম্ভাব্য পণ্য (Potential Product): এটি পণ্য স্তরের সর্বশেষ স্তর। সম্ভাব্য পণ্য বলতে বর্ধিত পণ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রেতারা ভবিষ্যতে পণ্যের কি পরিবর্তন আশা করে। অর্থাৎ বর্তমান পণ্যের সাথে অতিরিক্ত যা আছে তা বর্ধিত পণ্য হিসেবে

বিবেচিত, পক্ষান্তরে ক্রেতারা ভবিষ্যতে যা আশা করে তাকেই সম্ভাব্য পণ্য বলে। বর্তমানে সম্ভাব্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বেশি। কারণ এর দ্বারাই কেবলমাত্র ভোক্তাদের কাছে তাদের অর্পণ তুলে ধরা সম্ভব। একটা পণ্যের কাছ থেকে ক্রেতারা সে সকল সুবিধা প্রত্যাশা করে না, সে ধরনের সুবিধা যদি ক্রেতাদের দেওয়া হয় তবে সেটাকেও সম্ভাব্য পণ্য বলা হয়। ভোক্তা হয়তো চিন্তা করবে কক্ষের সর্বত্র শীতলতার মাত্রা যেন সমানভাবে স্থিতিশীল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। সে কারণে হোটেল মালিকগণ হোটেলে সেন্ট্রাল এসির ব্যবস্থা করছে।

পণ্য ও ব্র্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য

Difference between Product and Brand

উপরের আলোচনা থেকে পণ্য সম্পর্কে আমাদের একটি বিশেষ ধারণা লাভ হয়েছে । ব্র্যান্ড হলো একটি নাম, শব্দ, নকশা, প্রতীক বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যা একজন বিক্রেতার পরিসেবাকে অন্য বিক্রেতাদের পরিসেবা থেকে আলাদা করে। ব্র্যান্ড এবং পণ্যকে খুব কাছাকাছি মনে হলেও এদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ব্র্যান্ড এবং পণ্যের পার্থক্যগুলো বিভিন্ন শিরোনামে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. উৎপাদন উৎস: একটি পণ্য কারখানায় উৎপাদিত হয়। একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি একটি নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করে থাকে। কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদিত হয়। একটি ব্র্যান্ড উৎপাদিত হয় ক্রেতার মন থেকে। ক্রেতার বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি ব্র্যান্ড সৃষ্টি হয়।

২. সম্পর্ক: পণ্য ক্রেতার প্রয়োজনের সাথে জড়িত। যেমন— একজন ব্যক্তির জুতার প্রয়োজন থাকতে পারে। ব্র্যান্ড অভাবের সাথে সম্পর্কিত বা জড়িত। যেমন— একজন মানুষের জুতার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু তিনি ক্রয় করতে চান বাটা কোম্পানির জুতা।

৩. উপস্থাপন: পণ্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হয়। বাজারে সমজাতীয় বহু পণ্যের সমাবেশ ঘটে। ব্র্যান্ডের মাধ্যমের পণ্যের পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ বাজারে উপস্থাপন করা হয়, এর মাধ্যমে একটি কোম্পানির পণ্য থেকে অন্য কোম্পানির পণ্যকে আলাদা করা যায়।

৪. দৃশ্যমানতা: পণ্য দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান হয়ে থাকে। পণ্যকে সহজেই বহন ও বিনিময় করা যায়। দৃশ্যমান পণ্য যেমন— টেবিল বা চেয়ার এবং অদৃশ্যমান পণ্য যেমন— ব্যাংক বা বীমা। ব্র্যান্ড একটি অদৃশ্যমান সত্ত্বা। ব্র্যান্ডের স্বাদ বা গন্ধ নেয়া যায় না। ব্র্যান্ড সর্বদাই অদৃশ্যমান হয়ে থাকে।

৫. নকল প্রবণতা: পণ্যকে সহজেই নকল করা যায়। যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পণ্যকে সহজেই নকল করতে পারে। কিন্তু ব্র্যান্ড কপিরাইট দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। ফলে ব্র্যান্ডকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করলেই নকল করতে পারে না।

৬. পরিবর্তনশীল: পরিবর্তনশীলতা পণ্যের একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য। স্থান, কাল ভেদে পণ্যকে পরিবর্তন করতে হয়। এছাড়া পরিবেশ, প্রযুক্তি ও চাহিদার কারণে পণ্যের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু একটি ব্র্যান্ড একবার সৃষ্টি হলে তা দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকে। ব্র্যান্ডকে সহসা পরিবর্তন করা যায় না।

৭. জীবন চক্র: একটা পণ্যের নির্দিষ্ট জীবন চক্র রয়েছে। পণ্য উৎপাদনের পর তাকে একটা নির্দিষ্ট জীবন চক্রের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে হয়। ব্র্যান্ডের এই ধরনের কোন জীবন চক্র নাই। ব্র্যান্ড যেভাবে সৃষ্টি হয় ঠিক সে ভাবেই প্রবাহিত হয়ে তাকে।

৮. প্রতিস্থাপন: যদি দুইটি পরস্পর প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের দুইটি পণ্য একই সুবিধা প্রদান করে তবে একটি পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্যটি প্রতিস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু ব্র্যান্ড হলো একটি অনন্য সত্তা। ব্র্যান্ডকে প্রতিস্থাপন বা বদল করা যায় না।

৯. অর্থপূর্ণতা: নতুন পণ্য বাজারে আসলে সেটাকে সহজেই এবং তাৎক্ষণিকভাবে অর্থপূর্ণ করা যায়। কারণ পণ্যটি ভোক্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করে। কিন্তু ব্র্যান্ড ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থহীন, যতক্ষণ পর্যন্ত ভোক্তাদের কাছে ব্র্যান্ডের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস না জন্মে।

১০. কার্যক্রম: পণ্যের কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন বিষয় জড়িত থাকে। যেমন- পণ্য বন্টন, বিনিময় ও উৎপাদন। এছাড়াও পণ্যকে ঘিরে আরো কিছু সহায়ক কার্যক্রম জড়িত থাকে। ব্র্যান্ডের প্রধান কাজ হলো ব্র্যান্ড ভ্যালু সৃষ্টি ও পণ্য পজিশনিং করা।

১১. আওতা: সকল পণ্য ব্র্যান্ড নয়। পণ্য উৎপাদনের পর বিক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থাপন করলে সেটাকে পণ্য বলা হয়। যে সকল পণ্যেকে নাম, লোগো, ডিজাইন, প্রতীক ইত্যাদি দ্বারা অন্য পণ্য থেকে পার্থক্য করা হয় তাদেরকে ব্র্যান্ড বলে। তাই বলা হয় সকল পণ্য ব্র্যান্ড নয় কিন্তু সকল ব্র্যান্ডই পণ্য।

উপসংহারে আমরা একটি ছকের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ও পণ্যের পার্থক্যসমূহ উপস্থাপন করতে পারি।

পণ্য	ব্র্যান্ড
পণ্য কারখানায় উৎপন্ন হয়	ব্র্যান্ড ক্রেতাদের মনে উৎপন্ন হয়
পণ্য ক্রেতার নীডের সাথে জড়িত	ব্র্যান্ড ক্রেতার অভাবের সাথে জড়িত
পণ্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হয়	ব্র্যান্ড বাজারে পার্থক্য সৃষ্টি জন্য উপস্থাপন করা হয়
পণ্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান হয়ে থাকে	ব্র্যান্ড অদৃশ্যমান হয়ে থাকে
পণ্যকে সহজেই নকল করা যায়	ব্র্যান্ডকে সহজে নকল করা যায় না
পণ্য স্বল্পমেয়াদী হয়ে থাকে	ব্র্যান্ড দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে
পণ্যের জীবন চক্র রয়েছে	ব্র্যান্ডের জীবন চক্র নেই
পণ্য প্রতিস্থাপিত হতে পারে	ব্র্যান্ড প্রতিস্থাপিত হতে পারে না
পণ্য বন্টন, বিনিময় এর সাথে জড়িত	ব্র্যান্ড ভ্যালু সৃষ্টির সাথে জড়িত
সকল পণ্য ব্র্যান্ড নয়	সকল ব্র্যান্ডই পণ্য

ব্র্যান্ড নাম ও ধরন

Brand Name and Style

একটি ব্র্যান্ডের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। ব্র্যান্ডের যে অংশ উচ্চারণ করা যায় তাকে ব্র্যান্ড নাম বলে। অন্যভাবে বলা যায় কোনো পণ্যের ব্র্যান্ডের যে অংশটা পড়া যায় বা বলা যায় তাকে ব্র্যান্ড নাম বলা হয়। কোনো পণ্য উৎপাদনের পর উৎপাদক সেই পণ্যকে যে নামে অভিহিত করে তাকে ব্র্যান্ড নাম বলে। যেমন— লাক্স, লাইফবয়, তিব্বত, মেরিল, কোকাকোলা, রোলেক্স, সিটিজেন ইত্যাদি। ব্র্যান্ড নাম কেবল একটি পণ্যকে নয় বরং এর প্রস্তুতকারককেও সনাক্ত করে। টয়োটা ব্র্যান্ড নাম দ্বারা কেবলমাত্র একটি গাড়ির নামকে প্রকাশ করে এমন নয় বরং এই ব্র্যান্ড নামের সাথে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নামও জড়িয়ে থাকে।

MaCarthy & Perreault এর মতে, 'A brand name is a word, letter, or a group of words or letter.' অর্থাৎ, শব্দ বা বর্ণ কিংবা বর্ণের সমষ্টিকে ব্র্যান্ড নাম বলে।

Bovee, Houston & Thill এর মতে, "A brand name is the portion of a brand that can be expressed verbally, including letters, words or numbers." অর্থাৎ, ব্র্যান্ড নাম হলো ব্র্যান্ডের সেই অংশ যা বর্ণ, শব্দ বা সংখ্যা দ্বারা উচ্চারণ করা যায়। পরিশেষে বলা যায়, একটি পণ্যের ব্র্যান্ডের যে অংশটা পড়া যায় বা বলা যায় তাকে ব্র্যান্ড নাম বলা হয়।

ব্র্যান্ড নামের ধরন

Brand Name Style

ব্র্যান্ড নামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরন প্রকাশ পেয়ে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠান, খুচরা দোকান, জনগণ, স্থান, পণ্যের গুণাগুণ ইত্যাদি অনুযায়ী পণ্যের ব্র্যান্ড নাম নির্বাচন করে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ক. প্রতিষ্ঠানের নামে (Name of Company): অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে বেশি বেশি প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট থাকে। তাই তারা নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে ব্র্যান্ড নাম করে থাকে। এটা একটা ব্র্যান্ড নামের পুরাতন ধরন। যেমন— নোকিয়া বা স্যামসাং কোম্পানি তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে ব্র্যান্ড নাম করছে। এক্ষেত্রে ক্রেতারা পণ্যটিকে প্রতিষ্ঠানের নামে চিনে থাকে।

খ. প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যতীত (Without the Name of Company): অনেক প্রতিষ্ঠান আবার ব্র্যান্ড নামের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার না করে অন্য নামে পণ্যের ব্র্যান্ড নাম করে থাকে। এখানে প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে ব্র্যান্ড নামের কোনো সম্পর্ক থাকে না। যেমন— ইউনিলিভার কোম্পানির অনেক পণ্য রয়েছে যার মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডসমূহ হলো লাক্স, ডাভ, ফ্লোরা, লিপটন, সানসিল্ক, রেকসোনা ইত্যাদি।

গ. খুচরা দোকানের নামে (Name of Retail Store): বণ্টন প্রণালীতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সদস্যগণ, যেমন— খুচরা কারবারি, পাইকারি কারবারি, বণ্টনকারী তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্র্যান্ডের নামকরণ করে থাকে। অনেক সময় খুচরা বিক্রেতাগণ বা ডিপার্টমেন্ট স্টোরসমূহ নিজেদের নামে বা অন্য কোনো উপায়ে তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড নাম সৃষ্টি করে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট মেক্সিকোতে ওয়ালমেক্স, যুক্তরাজ্যে অ্যাসডা, জাপানে সেইয়ু, ভারতে বেস্ট প্রাইস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

ঘ. জনগণের নামে (Name of People): কোম্পানি বা খুচরা কারবারীদের মত জনগণের নামে ব্র্যান্ড নাম হতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের স্থানীয় জনগণের নামে, সার্বিকভাবে জনগণের নামে অথবা ব্যক্তি নামের উপর ভিত্তি করেও ব্র্যান্ড নাম করে থাকে। যেমন— পৃথিবীতে প্রায় ১৫২টি দেশে ইসটি লোডার (উংঃবব খধঁফবৎ) ব্র্যান্ডের প্রায় ১৫টি পণ্য ব্যাপকভাবে বিক্রয় হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে ইসটি লোডার কসমেটিক্স খুবই জনপ্রিয় ব্র্যান্ড।

ঙ. স্থানের নামে (Name of Place): স্থানের উপর ভিত্তি করে ব্র্যান্ড নাম অনেক পুরাতন কৌশল। এটা মূলতঃ নির্ভর করে সেই স্থানের সুনামের উপর। এলাকার ইমেজকে ফোকাস করে অনেক সময় ব্র্যান্ড নাম করা হয়। যুক্তরাজ্যের সব থেকে বড় এয়ারলাইন হলো বৃটিশ এয়ারওয়েজ। উদাহরণ হিসেবে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইস এর কথা বলা যায়।

চ. প্রাণীর নামে (Name of Animals): প্রাণীদের আবেগ ও অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ব্র্যান্ড নাম করা হয়। আবার পশু বা পাখিদের নাম অনুসারে কোম্পানি তার পণ্যের ব্র্যান্ড নাম করে থাকে। যেমন— ডাভ সাবানের কথা বলা যেতে পারে। আবার টাইগার এনার্জি ড্রিংকস পান করে ক্রেতা নিজেকে টাইগারের মত বলবান ভাবতে পারে।

ছ. গুণগত মান অনুসারে নাম (Name According to Quality): অনেক কোম্পানি পণ্যের অন্তর্নিহিত গুণগত মান অনুসারে পণ্যের ব্র্যান্ড নাম করে থাকে। পণ্যের নাম শুনেই ক্রেতাদের মনে এক ধরনের আস্থা ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়। যেমন— অক্সি পিওর ড্রিংকিং ওয়াটার এর কথা বলা যায়। এখানে পণ্যের নামের সাথে জড়িয়ে আছে পণ্যের গুণগত মান।

জ. গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে নাম (Name According to Feature): অনেক কোম্পানি কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে তার পণ্যকে ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করতে চায়। ফলে প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে পণ্যের ব্র্যান্ড নাম করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এরামেটিক কোম্পানির ১০০ ভাগ হালাল সাবানের কথা বলা যায়। এখানে ‘হালাল’ পণ্যের এই বৈশিষ্ট্যটি ক্রেতাদের মনে দারুন প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

ঝ. প্রত্যয় ও উপসর্গযোগে নাম (Name According to Suffixes and Prefixes): বিভিন্ন নামের সাথে প্রত্যয় ও উপসর্গ যুক্ত করেও পণ্যের ব্র্যান্ড নাম করা হয়ে থাকে। এই সকল প্রত্যয় বা উপসর্গসমূহ পণ্যের মান মর্যাদা প্রকাশ করে। কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্র্যান্ড নাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন— লেকসাস বিস্কুট বা লেকসাস গাড়ির কথা বলতে পারি। ইন্টেল মাইক্রোপ্রসেসর তাদের ব্র্যান্ড নামের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে।

ঞ. অন্যান্য শ্রেণি (Name with Other Category): উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও অনেক কোম্পানি বিমূর্ত সংক্ষিপ্তসার, ভাবমূলক, কাল্পনিক ইত্যাদি বিষয়সমূহ ব্যবহার করেও পণ্যের ব্র্যান্ড নাম করতে পারে। যেমন— আপেল কম্পিউটার, ফেসবুক, এডিডাস, পেপসি, আসানা ইত্যাদি। এই ব্র্যান্ড নামগুলো ধারণাগত, বুদ্ধিগত বা অধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

সারসংক্ষেপঃ

পণ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য হলো, মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে এমন দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বিষয়সমূহ। সামগ্রিকভাবে উপযোগ সৃষ্টিকারী সকল বিষয়কেই পণ্য বলা যায়। পণ্য কেবল বস্তুগত বিষয়ই হবে এমন নয়, অবস্তুগত বিষয়সহ সেবা, ব্যক্তি, স্থান, সংগঠন, ইভেন্টস, অভিজ্ঞতা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদি সবকিছুই পণ্যের আওতার মধ্যে পড়ে। বিপণনকারীগণ বিভিন্ন স্তরে পণ্যসমূহকে চিহ্নিত করেছে। পণ্যের স্তরসমূহ হলো মৌলিক পণ্য, সম্ভাব্য পণ্য, বর্ধিত পণ্য, প্রত্যাশিত পণ্য, বস্তুগত পণ্য। পণ্য ও ব্র্যান্ডকে অনেকেই মনে করে একই বিষয়, কিন্তু এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পণ্য তৈরি হয় কারখানায়, ব্র্যান্ড তৈরি হয় মানুষের মনে। আবার পণ্য একটি স্বল্পমেয়াদী, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বিষয়। অন্যদিকে ব্র্যান্ড হলো একটি দীর্ঘমেয়াদী ও দৃশ্যমান বিষয়। একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য ব্র্যান্ডে পরিণত হয়। তাই বলা হয় সকল ব্র্যান্ডই পণ্য কিন্তু সকল পণ্যই ব্র্যান্ড নয়। ব্র্যান্ড নামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরন প্রকাশ পেয়ে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠান, খুচরা দোকান, জনগণ, স্থান, পণ্যের গুণাগুণ ইত্যাদি অনুযায়ী পণ্যের ব্র্যান্ড নাম নির্বাচন করে থাকে।

পাঠ-১.৩ ব্যান্ডিংয়ের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Branding

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ডিংয়ের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডিংয়ের বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- অনলাইন ও অফলাইন ব্র্যান্ডিং বর্ণনা করতে পারবেন।

বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডিং দেখা যায়। বিপণনের আওতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ব্র্যান্ডিংয়ের আওতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। একসময় কেবল মাত্র বস্তুগত পণ্য নিয়ে ব্র্যান্ডিং করা হতো এবং পরে সেবা পণ্যের ব্র্যান্ডিং অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখন নানাবিধ বিষয় নিয়ে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের ফলে ব্র্যান্ডিং মানুষের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। পণ্য, সেবা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এক সময় কেবল রেডিও বা টেলিভিশনের মাধমে পণ্য ব্র্যান্ডিং করা হতো। অনলাইন সৃষ্টির পর ব্র্যান্ডিংয়ের পুরো চিত্রটা পাল্টে গেছে। ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্র্যান্ডিংয়ের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়া কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করছে। একটি প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের ব্র্যান্ডিং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা প্রধানত নির্ভর করে তাদের ব্যবসা প্রকৃতির উপর। যারা ই-বিজনেস নিয়ে কাজ করে তারা পছন্দ করবে কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং অন্যদিকে যারা পরিবহন ব্যবসা নিয়ে কাজ করে তারা সেবা ব্র্যান্ডিংকেই গ্রহণ করবে। একটি প্রতিষ্ঠান যে ধরনের ব্র্যান্ডিং গ্রহণ করুক না কেন এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু যোগাযোগের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধি করা।

ব্যান্ডিংয়ের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Branding

মূলতঃ ব্র্যান্ডিং হলো এক ধরনের বিপণন প্র্যাকটিস যার অধিনে পণ্য বা সেবা প্রদানকারি কোম্পানির স্বতন্ত্র নাম, শর্ত, লোগো, ট্যাগ, শ্লোগান, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করে তার সঠিক পরিচিতি ক্রেতার কাছে তুলে ধরা হয়। এতে ক্রেতা সহজেই পণ্য সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারে এবং পণ্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডিং দেখতে পায়। একটি প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের ব্র্যান্ডিং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা প্রধানত নির্ভর করে তাদের ব্যবসায়ের প্রকৃতির উপর। যারা ই-বিজনেস নিয়ে কাজ করে তার পছন্দ করবে পণ্য বা কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং। অন্যদিকে যারা হোটেল ব্যবসার সাথে জড়িত তারা সেবা ব্র্যান্ডিংকেই গ্রহণ করবে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডিংয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

১. ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং (Personal Branding): ব্র্যান্ডিং এর কথা মনে পড়লে প্রথম আমাদের পণ্য বা সেবা ব্র্যান্ডিং এর কথা মনে পড়ে। কিন্তু এর বাইরেও একজন ব্যক্তি ব্র্যান্ডিংয়ের আওতাভূক্ত হতে পারে। একজন ব্যক্তির বিশেষ পরিচিতি ও স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তাকে ব্র্যান্ডে পরিণত করতে পারে। আমরা যখন ব্যক্তি ব্র্যান্ডিংয়ের কথা বলি তখন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। উদাহরণস্বরূপ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বিখ্যাত খেলোয়াড়, জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা বা সংগীত শিল্পীর কথা বলা যায়। এটা কেবল ধনী ব্যক্তি বা বিশিষ্ট্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা নয়, নিজের দক্ষতা দিয়ে একজন ব্যক্তি নিজেকে বিভিন্ন ভাবে ব্র্যান্ডিং করতে পারে। শাহরুখ খানকে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে কিং খান বা মেসিকে ফুটবলের যাদুকর হিসেবে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি নিজের মেধা ও বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেকে ব্র্যান্ডিং করছে। একজন নতুন উদ্যোক্তা বা ফ্রিল্যান্সার নিজের ওয়েব সাইটে তাদের ব্যক্তিগত পোর্টফোলিও প্রকাশ করতে পারে। সবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং ফলপ্রসূ হয় না বা করার প্রয়োজন হয় না। যার ব্যক্তিগত দক্ষতা রয়েছে এবং যিনি সমাজে সুনাম এবং সুখ্যাতির সৃষ্টি করেছেন তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং কার্যকর হয়ে থাকে। কারো ব্যক্তিগত জীবনে যদি কোনো নেতিবাচক দিক থাকে তবে তা ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বিপদ সৃষ্টি করবে এবং তাকে জড়িয়ে যদি কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তবে সেটা সেই ব্যবসাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। নায়িকা দিপীকার ক্রেজকে ব্যবহার করে লাক্স যেমন সফলতা লাভ করেছে, অন্যদিকে ম্যাডোনার ক্রেজকে ব্যবহার করে পেপসির অসফল হয়েছিল। আপনাকে একটি সাবানের নাম বলতে বলা হলো অনেক সাবান থেকে আপনি কোন সাবানের কথা বলবেন? অবশ্যই যে সাবানের নাম আপনার মনের মধ্যে সব সময় ভাসে আপনি সেটার নামই বলবেন। মানুষ তার কাজের দক্ষতাগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবার সামনে প্রকাশ করতে চায়। এখন অনেক রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, বা নানা পেশাজীবি মানুষ তাদের নামে ফেসবুক পেইজ খুলছে বা অনেকের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। এখানে তারা নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে নিজেকে যেমন সফল করা যায় তেমনি ব্যবসা বাণিজ্যকেও সফল করা যায়।

২. পণ্য ব্র্যান্ডিং (Product Branding): আমাদের চারিদিকে হাজারো পণ্য ছড়িয়ে আছে। এ সকল পণ্যসমূহ আমাদের নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত। এ সকল পণ্যসমূহকে আমরা তাদের নাম, লোগো, প্রতীক, চিহ্ন বা শ্লোগানের মাধ্যমে চিনে থাকি। সাধারণত এক কোম্পানির পণ্য থেকে অন্য কোম্পানির পণ্য আলাদা ভাবে উপস্থাপন করার জন্য পণ্য ব্র্যান্ডিং করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ক্রেতাদের পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার ও ক্রেতাদের মনে পণ্য অবস্থান তৈরি করার জন্য পণ্য ব্র্যান্ডিং করা হয়ে থাকে। এছাড়াও মূলত ব্র্যান্ড সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রেতাদের পণ্য সম্পর্কে গভীর আবেগ সৃষ্টির জন্য পণ্য ব্র্যান্ডিং করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং এর মতই পণ্য ব্র্যান্ডিং করা হয় এবং যাদের পণ্যটি প্রয়োজন তারা সাড়া প্রদান করে। এখানে পণ্য ও ক্রেতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্র্যান্ডিং করা হয়। একটি সাধারণ আসবাবপত্র ও উচ্চ বিলাসবহুল আসবাবপত্রের জন্য একই ভাবে ব্র্যান্ডিং করা হয় না। এই দুই শ্রেণির পণ্যের জন্য ক্রেতাদের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই ব্র্যান্ডিংও হয় ভিন্ন রকমের। আবার উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্যসমূহ যেমন— বিভিন্ন ধরনের পণ্য উপাদান দিয়ে পণ্য ব্র্যান্ডিং করছে তেমনি প্রচলিত সাধারণ পণ্যসমূহ নিজেদের স্টাইলে পণ্য ব্র্যান্ডিং করছে। গাড়ি, কম্পিউটার বা টেলিভিশনের পাশাপাশি চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি পণ্যসমূহ ব্যাপকভাবে ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় চলে এসেছে। হোমমেড অথবা পরিবেশ বান্ধব বিষয়গুলো ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় নিয়ে এসে বিপণনকারীগণ ব্যাপক সফলতা লাভ করছে।

৩. সেবা ব্র্যান্ডিং (Service Branding): সেবা ব্র্যান্ডিং পুরোপুরি সেবাকে ফোকাস করে করা হয়ে থাকে। পণ্য ব্র্যান্ডিং থেকে সেবা ব্র্যান্ডিং একটু আলাদা হয়ে থাকে। যদিও ব্র্যান্ডিংয়ের মৌলিক বিষয় এবং কৌশলসমূহ সেবার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। তথাপি সেবার নিজস্ব কিছু পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে সেবার ব্র্যান্ডিং একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দৃশ্যমান বিষয়ের চেয়ে অদৃশ্যমান বিষয়ের ব্র্যান্ডিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সবসময় একটি অনিয়ন্ত্রিত বিষয়। তবে এটা নয় যে সেবাকে ব্র্যান্ডিং করা যাবে না। বর্তমানে সেবার পরিসীমা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিপণনে সেবা ব্র্যান্ডিং এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ সর্বদা নিরাপদ, বিশ্বস্ত, নিয়মিত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সেবা পেতে চায়। সেবা ব্র্যান্ডিং করার সময় এই বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। বৃটিশ এয়ারওয়েজ তার ডায়াবেটিক যাত্রীদের ডায়েট কেক বা কোক অফার করছে বা কোনো সুনামধন্য রেস্তোরাঁ খাবার পরে ফ্রি ডেজার্ট অফার করছে। তাই সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন নতুন সেবা দিয়ে তাদের সেবার মানকে বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় করে তুলছে। সেবার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ব্র্যান্ডিং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সামাজিক যোগাযোগে সেবার অভিজ্ঞতার বিবরণ দ্বারা সেবাকে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। সেবার সাথে ক্রেতার একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সে কারণে সেবা সবসময় পার্থক্যমূলক হতে হবে। সেবার মানকে সর্বদাই ধরে রাখতে হবে। কোনো সময় উচ্চ মানের সেবা বা কোনো সময় নিম্ন মানের সেবা প্রদান সেবা ব্র্যান্ডিংকে প্রভাবিত করে। যদিও সেবার মান ধরে রাখা প্রতিষ্ঠানের জন্য চ্যালেঞ্জের বিষয়। সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদান কোম্পানির ব্র্যান্ড ও সুনামকে নিশ্চিত করে। তাই বর্তমানে প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদান করে ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।

৪. রিটেল ব্র্যান্ডিং (Retail Branding) : ব্র্যান্ডিংকে যখন খুচরা কারবারে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে রিটেল ব্র্যান্ডিং বলা হয়। প্রতিযোগী পরিবেশে খুচরা স্টোরগুলোকে বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। গ্রাহকদের মনে খুচরা স্টোর সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা তৈরি করে রিটেল ব্র্যান্ডিং। গ্রাহকদের মনে খুচরা স্টোর সম্পর্কে ইতিবাচক সাড়া তৈরি করতে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কৌশল গ্রহণ করে থাকে। পণ্য বা সেবা ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে রিটেল ব্র্যান্ডিংয়ের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন— দেখা যায় সব শ্রেণির ক্রেতারা একই রেস্তোরায় খেতে পছন্দ করে না। অনেক গরমে মানুষ পণ্য ক্রয় করার জন্য সেই খুচরা স্টোরটি পছন্দ করবে যেখানে এসি রয়েছে। সে কারণে খুচরা স্টোরগুলো নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্টোরগুলো ব্র্যান্ডিং করছে। একটা স্টোরের পরিচিতি যত বেশি শক্তিশালী হবে সেই স্টোরের ক্রেতার সংখ্যা ততো বেশি হবে। ক্রেতারা তাদের পছন্দনীয় স্টোরে ছবি তুলছে এবং তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। এখানে ক্রেতাগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত শেয়ার করছে, আবার ভাল পণ্য সংরক্ষণ ও নিয়মিত পণ্য সরবরাহ করেও রিটেল স্টোরগুলো নিজেকে ব্র্যান্ডিং করছে। রিটেল স্টোরকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি ভালো গল্প তৈরি করা যায় যা ক্রেতা আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে। একটি সফল রিটেল স্টোর জানে তার ক্রেতারা কী চায় এবং তারা সে ভাবেই তাদের স্টোর ব্র্যান্ডিং করে থাকে।

৫. কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং (Corporate Branding): কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং এমন একটি ব্র্যান্ডিং কৌশল যা পণ্য, সেবা বা স্টোরের পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রচার ও ব্র্যান্ডিং করে থাকে। কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং প্রতিষ্ঠানের নাম, লোগো, মান, ম্যাসেজ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং বাজারের পার্থক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি সৃষ্টিশীল কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধকে প্রকাশ করে। এখানে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ভিজ্যুয়াল পরিচয় প্রতিফলিত হয়। পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ে কেবল একটি পণ্য নিয়ে ব্র্যান্ডিং করা হয় কিন্তু কর্পোরেট ব্র্যান্ডিংয়ের আওতা অনেক বেশি। এখানে পণ্যসহ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বিষয় প্রতিফলিত হয়। কর্পোরেট ব্র্যান্ড এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের যোগাযোগের উপায়গুলো কর্পোরেট ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার হিসেবে পরিচিত। কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং একটি চিহ্ন বা প্রতীকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে অনেকগুলো টাচপয়েন্ট আন্তর্ভুক্ত থাকে। এই টাচপয়েন্টে রয়েছে অনেক উপাদান, যেমন— লোগো, গ্রাহক সেবা, কর্মী সুবিধা, প্রশিক্ষণ, প্যাকেজিং, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রমের চেয়ে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা রাখে। এটি মূলতঃ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সেলিং পয়েন্টগুলোকে ফোকাস করে। তারপর ঐ সেলিং পয়েন্টগুলোকে ক্রেতাদের সাথে সংযুক্ত করে। কর্পোরেট ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে প্রকৃত বিনিয়োগকারী ও বিজনেস পার্টনার খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণত

কর্পোরেট ব্র্যান্ডিংয়ে তিনটি বিষয়ের সমন্বয় সাধন হয়ে থাকে, যেমন— কোম্পানির কর্মীদের ধারণা কি, শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কী অর্জন করতে চায়, এবং বহিরাগত স্টেকহোল্ডারগণ কীভাবে উপলব্ধি করে।
কর্পোরেট ব্র্যান্ডিংয়ে দেখানো হয় কোম্পানি কী জানে বা কোম্পানির কী আছে সেটা নয় বরং গ্রাহকগণ এটাকে কীভাবে মূল্যায়ন করছে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছোট একটি ঘোষণা বা বিবৃত্তি প্রতিষ্ঠানের ইমেজ তথা প্রতিযোগি ব্র্যান্ড পার্থক্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। কর্পোরেট পরিচয় একটি ছবি বা প্রতীক দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন— ভকসওয়াগেন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের ব্র্যান্ডকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কর্পোরেট পরিচয়ের উপর অনেক ব্যয় করে।

৬. ভৌগোলিক ব্র্যান্ডিং (Geographical Branding): যখন কোনো শহর, এলাকা, অঞ্চল বা দেশকে ব্র্যান্ডিং করা হয় তখন তাকে ভৌগোলিক ব্র্যান্ডিং বলে। "আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি"— এটি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে। আইফেল টাওয়ার প্যারিস শহরকে প্রতিনিধিত্ব করে বা তাজমহল আগ্রা শহরকে প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক প্রতিষ্ঠান কোনো এলাকা, বিশেষ স্থান বা লোকেশনের নাম দিয়ে পণ্য বা সেবাকে ব্র্যান্ডিং করে থাকে। এভাবে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভৌগোলিক নামকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। মানুষ যে এলাকায় বড় হয়েছে বা বসবাস করছে সেই স্থানের প্রতি তার একটা দূর্বলতা কাজ করে। সৌদি আরবে বাংলাদেশ হোটেল, চট্টগ্রাম রেস্তোরাঁ বা নোয়াখালী ফুড কর্ণার ইত্যাদি নামে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি বছর বাংলাদেশী হজ্জ্ব যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্থানীয় ক্রেতাদের পাশাপাশি এই হোটেলগুলো বাংলাদেশীদের বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কখাঈ নাম শুনে আমাদের দক্ষিণের একটা স্বাদ ও বাড়িতে তৈরি খাবারের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। পৃথিবীব্যাপী সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্যসমূহকে ভৌগোলিক ব্র্যান্ডিং করছে। যেমন— আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক বা বৃটিশ এয়ারওয়েজের কথা বলা যায়। ভৌগোলিক ব্র্যান্ডিংকে অনেক সময় জাতীয় ব্র্যান্ডিং বলা হয়ে থাকে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভৌগোলিক ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় আনা হচ্ছে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ভাবে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব করছে। ভৌগোলিক ব্র্যান্ডিংয়ে একটা অঞ্চলের বা এলাকার ভ্যালুকে প্রকাশ করে এবং তার সুনামকে ব্যবহার করা হয়। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য স্বাভাবিক কারণেই এই ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় চলে আসে। একটা দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া ও মানুষের সৃজনশীলতা মিলে যখন কোনো পণ্য উৎপাদন হয় তখন তাকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম, রাজশাহীর সিল্ক বা দিনাজপুরের কাটারীভোগ চালের কথা বলা যায়। বর্তমানে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই ব্র্যান্ডিং ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। হলিউড বা বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে এই ব্র্যান্ডিংকে অনুসরণ করছে।

৭. সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিং (Cultural Branding): কোনো সাংস্কৃতি, উপ-সাংস্কৃতি বা নির্দিষ্ট গ্রুপকে ফোকাস করে যখন কোনো ব্র্যান্ডিং করা হয় তখন তাকে সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিং বলে। একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ যাদের মূল্যবোধ, চিন্তাধারা, প্রত্যক্ষণ, আবেগ ইত্যাদি এক ধরনের হয়ে থাকে, এই ব্র্যান্ডিংয়ে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়। বিশেষ করে যেখানে মিশ্র সাংস্কৃতি দেখা যায় সেখানে সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিং কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সাংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্র্যান্ডিংয়ের পরিকল্পনা করা হয়। সাংস্কৃতির সাথে খাপ-খাওয়ানোর উপর নির্ভর করছে ব্র্যান্ডিংয়ের সফলতা ও ব্যর্থতা। আসলে সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিং নতুন আদর্শ নয়, এটি একটি বিপণন কৌশল ও পদ্ধতি যা প্রতিষ্ঠানকে তাদের গ্রাহকের সাথে একই রকম মূল্যবোধ বা মতাদর্শকে যোগ করে অর্থপূর্ণ ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করে। এটি একটি বটম-আপ পদ্ধতি যেখানে পণ্যটি তাদের টার্গেট ক্রেতাদের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিবেচিত হয়। বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডে রোমান ক্যাথলিক ও প্রেটেস্ট্যান্টদের জন্য আলাদা আলাদা সংবাদপত্র আছে। সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিংয়ে সবসময় সাংস্কৃতির স্পর্শকাতর উপাদানগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। বোতলে নগ্ন মহিলার ছবি থাকায় সৌদি আরব ফ্রান্সের সুগন্ধীর একটি চালান বাজেয়াপ্ত করেছিল। এই ব্র্যান্ডিংয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। আমেরিকা বা ইউরোপের বাজারে হালাল খাদ্য ভাণ্ডার বা হালাল স্টোরগুলোতে মুসলমান ক্রেতাদের আধিক্য দেখা যায়। বিভিন্ন উন্নয়ন ও আবিষ্কারের সাথে সাথে ব্যাপক ভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিং করা প্রয়োজন। একসময় আমাদের দেশে জিনস্ প্যান্টের প্রচলন ছিল না। এটি পশ্চিমারা ব্যবহার করত। এখন এটি আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ব্র্যান্ডিং কৌশলকে সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণ, প্রতিরোধ, অথবা প্রত্যাখ্যানের আলোকে বিবেচনা করতে হবে। কীভাবে ব্র্যান্ডিং সংস্কৃতির সাথে ক্রিয়া করে তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় এর সফলতা ও ব্যর্থতা।

৮. অনলাইন ব্র্যান্ডিং (Online Branding): পণ্য, সেবা, ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং করাকে অনলাইন ব্র্যান্ডিং বলে। ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির কারণে পণ্য বা সেবা ব্র্যান্ডিং অনেক সহজ হয়ে গেছে। এক সময় কেবল মাত্র রেডিও, টেলিভিশন বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পণ্য বা সেবাসমূহ ব্র্যান্ডিং করা হতো। অনলাইন বিস্তারের পর

ব্র্যান্ডিংয়ের পুরো চিত্রটা পাল্টে গেছে। এখন অল্প খরচে, স্বল্প সময়ে বা বিনা মূল্যেও প্রতিষ্ঠান তার পণ্য বা সেবাকে ব্র্যান্ডিং করতে পারছে। কেবল বিজ্ঞাপন প্রদান করাটায় অনলাইন ব্র্যান্ডিংয়ের প্রধান কাজ নয় বরং ক্রেতাদের যথাযথ তথ্য প্রদান করাই এর মূল উদ্দেশ্য। যদিও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনগুলোর মত অনলাইন বিজ্ঞাপনসমূহ মানুষের কাছে বিরক্তির কারণ হচ্ছে। তবে মানুষকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে সুন্দর ব্র্যান্ডিং করা যায়। গ্রাহক ধরে রাখার জন্য এবং ক্রেতাদের আস্থা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে হবে। সাধারণ কিছু প্রদর্শন করলে গ্রাহক এটাকে সাধারণভাবেই গ্রহণ করবে। অনলাইন ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য কনটেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠান একটি ভাল কনটেন্ট বানাতে পারে যেখানে থেকে দর্শক বিনামূল্যেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। এখানে প্রতিষ্ঠান কোনো পণ্য বা সেবাকে ফোকাস না করে পণ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংযুক্ত করতে পারে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান টেলিভিশন বিক্রয় করে তবে টেলিভিশনের পাশাপাশি কীভাবে টেলিভিশনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, টেলিভিশনের পরিচর্যা, টেলিভিশনের ব্যবহার বিধি, টেলিভিশনের প্রযুক্তিগত দিক ইত্যাদি নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করতে পারে। অনলাইন ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভিউগুলো সামাজিক মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে গ্রাহকগণ উৎসাহ বোধ করে। অনলাইন ব্র্যান্ডিংকে সফল করার জন্য পণ্যের গুণগত মানকে নিশ্চিত করতে হবে।

৯. অফলাইন ব্র্যান্ডিং (Offline Branding): ডিজিটাল মিডিয়ার বাইরে পণ্য বা সেবা ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য যে সকল কৌশল বা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাকে অফলাইন ব্র্যান্ডিং বলে। এটা অনলাইন উপস্থিতি ছাড়াই প্রবাহিত হয়। মোট কথা কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক সংযোগের আশ্রয় না নিয়ে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালিত হলে তাকে অফলাইন ব্র্যান্ডিং বলে। এখানে বিভিন্ন প্রচারমূলক পদ্ধতি যেমন— পোস্টার, ব্রোশিওর, মুদ্রিত বিজ্ঞাপন, ব্যবসায়িক কার্ড, স্পনসরশিপ, বিলবোর্ড, ইভেন্ট ও কর্মশালা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এটা কেবল একটা প্রতিষ্ঠানের লোগো নয় অধিকিন্তু লোগোর চাইতে অনেক কিছু বোঝায়। পণ্য ও ব্র্যান্ডিং নিয়ে ক্রেতার অনুভব, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে বোঝানো হয়। বলা হয়ে থাকে যদি অনলাইন না থাকে তবে কেউ অফলাইনে পণ্য দেখবে না। তথাপি ডিজিটাল বিপ্লবের পরও অফলাইনে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল দর্শক অনলাইন ব্যবহারে অভ্যস্ত নয় এবং যাদের প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা নেই তাদের কাছে পণ্য ব্র্যান্ডিং করার জন্য অফলাইনের কোনো বিকল্প নাই। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার স্থাপন করে লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তাছাড়া যদি সঠিকভাবে অফলাইন মিডিয়া নির্বাচন করা হয় তবে যথাযথ ব্র্যান্ডিংয়ের সুবিধা লাভ করা যায়। এছাড়া সকল ধরনের ব্র্যান্ডিং ইন্টারনেটে কার্যকর হয় না। কিছু বিষয়ের ব্র্যান্ডিং এখনো অফলাইনে ভীষণ কার্যকর হয়ে থাকে। উসাইন বোল্ট যখন নাইকির টি-শার্ট ব্যবহার করছে, টেলিভিশনে বক্তব্য প্রদান করছে অথবা খেলাধুলার ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদ হচ্ছে তখন নাইকির ব্র্যান্ডিং যথাযথ ভাবে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে। অনেকেই এখন অফলাইন ব্র্যান্ডিংকে সেকেলে বলে উল্লেখ করছে। তবে বিপণনে অফলাইন ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষমতাকে কখনই অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। অনেক গ্রাহক এখনও অফলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা সম্পর্কে তথ্য পেতে পছন্দ করে। আসলে প্রতিদিন কোন না কোন ভাবে বেশিরভাগ মানুষ অফলাইন ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে যুক্ত থাকছে। এটা বলা কঠিন যে, ঠিক কতজন দর্শক সরাসরি অফলাইনে জড়িত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে অফলাইন এবং অনলাইনের সমন্বয়ে বিপণন কার্যক্রম এবং ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ব্যানার, পোস্টার বা রিটেল স্টোর থেকে ছবি তুলে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। আবার ক্রেতারা অনলাইনে পণ্যের অর্ডার দিচ্ছে এবং অফলাইন পণ্যের ডেলিভারী দেয়া হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ:

মূলতঃ ব্র্যান্ডিং হলো একটি বিপণন প্র্যাকটিস যার অধিনে কোনো পণ্য বা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র নাম, লোগো, প্রতীক, ট্যাগ, ইত্যাদি করে তার সঠিক পরিচিতি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা হয়। আমাদের চারপাশের হাজারো পণ্য রয়েছে যাদের আমরা তাদের নাম, চিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে চিনতে পারি। বিপণন কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডিং দেখা যায়। যেমন— একজন ব্যক্তির বিশেষ পরিচিতি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তাকে ব্র্যান্ডে পরিণত করতে পারে। একটা পণ্যের প্রতি গভীর আবেগ সৃষ্টির জন্য পণ্য ব্র্যান্ডিং করা হয়ে থাকে। পুরোপুরি সেবাসমূহকে ফোকাস করে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। সেবাসমূহকে তার পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। আবার ব্র্যান্ডিং যখন খুচরা কারবারে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে রিটেল ব্র্যান্ডিং বলা হয়। কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং এমন একটি কৌশল যা পণ্য বা সেবা স্টোরের পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রচার ও ব্র্যান্ডিং করা হয়ে থাকে। যখন কোনো শহর এলাকা বা অঞ্চলকে ব্র্যান্ডিং করা হয় তখন তাকে ভৌগোলিক ব্র্যান্ডিং বলে। কোনো সাংস্কৃতি, উপ-সাংস্কৃতি বা কোনো নির্দিষ্ট গ্রুপকে ফোকাস করে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। বর্তমানে পণ্য, সেবা বা প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে অফলাইন এবং অনলাইনের সমন্বয়ে বিপণন কার্যক্রম এবং ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ব্যানার, পোস্টার বা রিটেল স্টোর থেকে ছবি তুলে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। আবার ক্রেতারা অনলাইনে পণ্যের অর্ডার দিচ্ছে এবং অফলাইন পণ্যের ডেলিভারী দেয়া হচ্ছে। যে সকল দর্শক অনলাইন ব্যবহারে অভ্যস্ত নয় এবং যাদের প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা নেই তাদের কাছে পণ্য ব্র্যান্ডিং করার জন্য অফলাইনের কোন বিকল্প নাই।

পাঠ-১.৪ ব্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব
Importance of Branding

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব কী তা বলতে পারবেন;
- ভোক্তা ও সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিপণনকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন; এবং
- ব্র্যান্ডিংয়ের সীমাবদ্ধতাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্র্যান্ডিং মানে শুধু প্রতিষ্ঠান বা পণ্যের লোগো বা নামকে চেনানো নয়। ব্র্যান্ডিং একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পণ্যের ইমেজ তৈরি করা হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য বড় আকারের বিনিয়োগ করে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে ব্র্যান্ড বিপণন নামে একটি বিশেষ বিভাগ রয়েছে। বাজারে অনেক টুথপেস্ট প্রচলিত রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি ব্র্যান্ডের নাম বলতে বলা হলে হয়তো অনেকের মনে সেনসোডাইন টুথপেস্টের কথা মনে হবে, কারণ এখানে বলা হচ্ছে এই টুথপেস্ট দাঁতের গভীরে প্রবেশ করে নার্ভকে সুরক্ষার প্রদান করে। এখানে দাঁতের সুরক্ষার বিষয়টা ক্রেতাদের মনের মধ্যে অবস্থান করে। ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি হয়। ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যার কারণে গ্রাহক তার প্রয়োজনীয় পণ্যকে চিনতে পারে। বাজারে প্রতিযোগী পণ্য থেকে একটি প্রতিষ্ঠান তার পণ্যটিকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করে। ব্যবসায়ে শুরু থেকেই ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিংয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা দরকার। অনেকেই ব্র্যান্ডিং এবং বিপণনকে এক ভেবে থাকে এবং বিপণন নিয়ে কাজ করলেই ব্র্যান্ডিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয় বলে ধারণা প্রকাশ করে। কিন্তু ব্র্যান্ডিং ও বিপণনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব এতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে ব্র্যান্ডিংকে বর্তমান ব্যবসায়ের প্রকৃত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব
Importance of Branding

পণ্য কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং হাতিয়ার হলো ব্র্যান্ডিং। অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ব্যবসা, সমাজ ও ডিজিটাল বিশ্বে ব্র্যান্ডিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটা মূলত বাজারে একটা প্রতিষ্ঠান পণ্য বা সেবার জন্য নিজস্ব জায়গা তৈরি করে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একমাত্র ব্র্যান্ডিংই পারে একটা প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে উপস্থাপন করতে। ব্র্যান্ডিংয়ের ফলে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানই উপকৃত হয় এমন নয় বরং ক্রেতা ও মধ্যস্থকারীগণ বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়। অন্যদিকে সঠিকভাবে পণ্য ব্র্যান্ডিং করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষতি হয়। ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য ব্র্যান্ডিংয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব উপস্থাপন এবং আলোচনা করা হলো:

ক. ভোক্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে (From the view point of customers): ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে ভোক্তারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। নিম্নে ভোক্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. পণ্য চিহ্নিত করা (To identity the product): ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে ক্রেতা তার কাঙ্ক্ষিত পণ্যটিকে খুব সহজেই শনাক্ত করতে পারে। মূলতঃ ব্র্যান্ডিং হলো এমন একটি মার্কেটিং কৌশল যার অধিনে পণ্য বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, লোগো, চিহ্ন, ট্যাগ, প্রতীক, পণ্য বৈশিষ্ট্য, সুনাম ইত্যাদি করে তার সঠিক পরিচিতি ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে ক্রেতা সহজেই কোম্পানির পণ্য সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র লাভ করতে পারে। যেমন— রোলেক্স, ওসাকা, ক্যাসিও, ওমেগা, সিকো ইত্যাদি আমাদের কাছে ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত।

২. মানসম্মত পণ্য ক্রয় (Buying quality products): ব্র্যান্ড প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পণ্য মানের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। প্রত্যেকটি ব্র্যান্ড তাদের পণ্য মানকে আলাদাভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। যাদের ঘড়ির প্রতি শখ আছে, তাদের কাছে রোলেক্স

একটি স্বপ্নের নাম। অসাধারণ এই ঘড়ির দামও আকাশচুম্বী। আবার বাজারে ক্যাসিও ঘড়ি খুব কম মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে রোলেক্স বা ক্যাসিও ঘড়ি ক্রয়ের মাধ্যমে উচ্চ বা নিম্ন মানসম্মত ঘড়ি ক্রয়ের নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে।

৩. ক্রয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase buying efficiency): আসলে ক্রয় প্রক্রিয়া একটি জটিল বিষয়। ক্রেতারা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে। অন্যদিকে পণ্য বা সেবা ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্রেতার সহজ মূল্যায়নের একটি ভালো উপায় হলো ব্র্যান্ডিং। ব্র্যান্ডিংয়ের ফলে ক্রেতার পণ্য ক্রয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে ক্রেতাগণ তাদের ক্রয় সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান পেয়ে থাকে। যার ফলে ক্রেতাগণ সহজে দক্ষতার সাথে তাদের ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে।

৪. পুনঃক্রয়ে সহায়তা (Help re-buying): ব্র্যান্ডিং যেহেতু ক্রেতার মনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে সেই কারণে ক্রেতা বিকল্প কোনো পণ্য ক্রয়ের দিকে মনোযোগী হয় না। আবার প্রথম ক্রয়ের পর ক্রেতা যদি পণ্য থেকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে তবে পুনঃক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা উক্ত ব্র্যান্ডটি পছন্দ করবে। এর ফলে ক্রেতা যখনই পণ্য ক্রয় করবে তখনই তার কাছে এই নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ছাড়া বিকল্প ব্র্যান্ড গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে পুনঃক্রয়ের মাধ্যমে একজন সাধারণ ক্রেতা ঐ পণ্যের নিয়মিত ক্রেতায় পরিণত হয়।

৫. সময় ও পরিশ্রম সাশ্রয় (Save time and effort): পণ্য ক্রয় প্রক্রিয়া একটি জটিল কার্যক্রম। পণ্য ক্রয়ের জন্য একজন ক্রেতার যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় সময়ের অভাবে একজন ব্যস্ত ক্রেতা যথাযথভাবে পণ্য ক্রয় করতে পারে না। তবে ব্র্যান্ডকৃত পণ্য ক্রেতাগণ সহজেই সনাক্ত করতে পারে। পণ্য ক্রয়ে ক্রেতার যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। ফলে কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে ক্রেতারা তাদের ব্র্যান্ডকৃত পণ্য ক্রয় করতে পারে।

৬. পণ্যের তুলনা (Product comparison): বাজারে সমজাতীয় পণ্যের মধ্যে প্রায় সকল পণ্যের ব্র্যান্ড নাম থাকে। পণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতাগণ বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের সাথে তুলনা করে থাকে। একজন ক্রেতা ঘড়ি কেনার সময় প্রথমত বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডের ঘড়ি পর্যবেক্ষণ করে এবং পরে তাদের গুণাগুণ, সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে ঘড়িটি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে ব্র্যান্ড বিভিন্ন সমজাতীয় পণ্যের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

৭. প্রতারণার সম্ভাবনা কম (Less possibility of cheating): বিপণনের মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন— পণ্য, মূল্য, বণ্টন ও প্রচার নিয়ে উৎপাদকগণের কিছু অঙ্গীকার থাকে। সাধারণত ব্র্যান্ডিং করা পণ্যসমূহ উৎপাদকগণের এই সকল অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। বিশেষ করে পণ্য মূল্য এবং প্রচার কার্যক্রম নিয়ে ক্রেতাগণ অনেক ক্ষেত্রে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। ব্র্যান্ডিংয়ের মান নির্ধারণের মাধ্যমে মূল্য নির্দিষ্ট করে এবং প্রচার অঙ্গীকারসমূহ যথাযথভাবে পালন করে থাকে। ফলে ক্রেতাদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৮. আইনগত সুরক্ষা (Legal protection): বিপণনের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং আইনগত নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। ব্র্যান্ডিংয়ের অংশ হিসেবে ট্রেডমার্কের মাধ্যমে উৎপাদক যেমন তার পণ্যসমূহকে নকল থেকে রক্ষা করতে পাওে, তেমন ক্রেতাগণ ব্র্যান্ডকৃত পণ্য ক্রয় করে কোনো বিষয় সমস্যা হলে সহজে আইনগত সুরক্ষা ও প্রতিকার লাভ করতে পারে । ব্র্যান্ডকৃত পণ্য থেকে ক্রেতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতি পূরণের জন্য ক্রেতাগণ সহজেই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

৯. ক্রেতা সন্তুষ্টি (Customer satisfaction): বিপণনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্রেতা সন্তুষ্টি। ব্র্যান্ডিং এবং ক্রেতা সন্তুষ্টি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ক্রেতারা সর্বদা উচ্চমূল্য দিয়েও প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয় করতে চায়। একই গুণসম্পন্ন নন-ব্র্যান্ডেড পণ্য ব্যবহার বা ক্রয় করে ক্রেতারা কখনোই সন্তুষ্টি লাভ করে না। আবার প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয়ের ফলে ক্রেতারা মানসম্মত পণ্য ক্রয়ের নিশ্চয়তা পায়। অনেক সময় ক্রেতারা পণ্যের জৈবিক দিকের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে পণ্যের প্রতীক বা ডিজাইনের দিকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। তাই ক্রেতাদের রোলেক্স ঘড়ি ব্যবহার করে চরম তৃপ্তি লাভ করে।

১০. বিপণন স্থিতিশীলতা (Marketing stability): বিপণন স্থিতিশীলতার জন্য ব্র্যান্ডিং একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। ব্র্যান্ডকৃত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার বাজার শেয়ার সম্পর্কে অবগত থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠান সহজেই তাদের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্র্যান্ডকৃত পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের অনুকূল মনোভাবের কারণে বিক্রেতাগণ সহজেই মূল্য প্রতিযোগিতা এড়াতে পারে। ব্র্যান্ডের মাধ্যমে পণ্য চিহ্নিত করে বিভিন্ন শ্রেণির ক্রেতাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বিপণন করা হয়। সার্বিকভাবে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে একটি পণ্যের বিপণন কার্যক্রম স্থিতিশীল থাকে।

খ. বিপণনকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে (From the viewpoint of marketers): ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে বিপণনকারীগন বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। নিম্নে বিপণনকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. ইমেজ সৃষ্টি করা (Creating image): যথাযথ ব্র্যান্ডিং ব্যবসাকে উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যায়। একটি ভালো ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা ছাড়া একটি কোম্পানি কোনো মতেই দীর্ঘ মেয়াদে বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে ব্র্যান্ডিংয়ের উপর। কোম্পানির পণ্য ও সেবার মান সম্পর্কে সঠিক ধারণা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে। ফলে ভাল ব্র্যান্ডকৃত পণ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার দ্রুত ইমেজ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. বাজার সম্প্রসারণ (Market expansion): একটা প্রতিষ্ঠিত ভালো ব্র্যান্ড কেবল দেশের চাহিদা পূরণ করে এমন নয় বরং এর চাহিদা সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। নাইকি ইনকর্পোরেশন খেলাধুলা সামগ্রীর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। নাইকি কেবল মাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই তাদের পণ্য বিক্রয় করে না বরং বিশ্বব্যাপী নাইকির চাহিদা রয়েছে। এভাবে পৃথিবীতে অনেক ব্র্যান্ড রয়েছে যাদের চাহিদা দেশের বাজার অপেক্ষা বিদেশেই বেশি।

৩. প্রচার সুবিধা (Promotional advantage): ব্র্যান্ডিং বিজ্ঞাপনসহ অন্যান্য বিপণন প্রমোশনে বিশেষ সহযোগিতা করে থাকে। পণ্য প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন একটি বিশেষ কৌশল। ব্র্যান্ডিং ছাড়া কার্যকর বিজ্ঞাপন সম্ভবপর নয়। ভালো ব্র্যান্ড নিজেই বিজ্ঞাপন হিসেবে কাজ করে। এটা খুব সহজেই সামাজিক যোগাযোগে ভাইরাল হয়। প্রচারের অন্যান্য হাতিয়ারগুলো ব্র্যান্ডের ইমেজকে কাজে লাগিয়ে থাকে। ভালো ও প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড বিজ্ঞাপন খরচ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সব মিলিয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের জন্য কোম্পানির বিপণন প্রসার কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

৪. বিপণন কৌশল (Marketing strategy): মূলত ব্র্যান্ডিং হলো একটি আক্রমণাত্মক বিপণন কৌশল। এখানে পণ্যকে আকর্ষণীয়ভাবে ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে উৎপাদনকারী বাজার থেকে মধ্যস্থকারীদের উচ্ছেদ করতে পারে। ব্র্যান্ড ইমেজের মাধ্যমে পণ্যের সুনাম বৃদ্ধি পায় । উৎপাদনকারী সঠিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে পারে। ব্র্যান্ড ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনকারী বাজার বিভক্তিকরণ করে থাকে। ফলে উৎপাদনকারী ব্র্যান্ডকে বিপণন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

৫. পণ্যের অবস্থান তৈরি (Create product positioning): পণ্যের অবস্থান তৈরি করতে ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা বিশেষ পণ্যের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক তৈরি হয় তার চাইতে অনেক বেশি সম্পর্ক তৈরি হয় ব্র্যান্ডের সাথে। আমরা দোকানে গিয়ে কোনো সময় বলি না যে আমাকে একটা টুথপেস্ট দিন বরং আমরা আমাদের পছন্দের ব্র্যান্ডটি খোঁজ করে থাকি। বিক্রেতাকে সরাসরি বলে থাকি যে, আমাকে একটা ক্লোজআপ বা সেনসোডাইন দিন। এটা আসলে ব্র্যান্ডিংয়ের কারণেই হয়ে থাকে। পণ্য অবস্থান তৈরির কারণে ব্র্যান্ডকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতাগণ বেশি মূল্য প্রদান করতে প্রস্তুত থাকে।

৬. পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি (Increase product demand): পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে ব্র্যান্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন কর। কোম্পানির একটি লোগো বা সফল পণ্যের একটি নাম খুব সহজেই বাজারে পরিচিতি পেয়ে থাকে। ক্রেতা পণ্য ক্রয় করার সময় সর্বদা তার পছন্দের ব্র্যান্ডটির কথা মাথায় রাখে। এছাড়া ব্র্যান্ডের ব্যাপারে ক্রেতা নিজে পণ্যটি ক্রয় করে এবং অন্যদের সেই ব্র্যান্ডের পণ্যটি ক্রয় করার জন্য পরামর্শ দেয়। প্রতিষ্ঠিত একটি ব্র্যান্ড সহজেই দেশে এবং বিদেশে প্রচার সুবিধা পায়। ফলে ব্র্যান্ডকৃত পণ্যের চাহিদা রাতারাতি বৃদ্ধি পায়।

৭. প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা (Dealing with competition): বর্তমানে প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করে বাজারে টিকে থাকা খুবই কষ্টের ব্যাপার। তবে পণ্য যথাযথভাবে ব্র্যান্ডিং করতে পারলে সহজেই প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করা যায়। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিংয়ের ফলে অনিয়মিত ক্রেতাগণ নিয়মিত ক্রেতায় পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড নিয়ে ক্রেতারা সবসময় পুলোকিত থাকে এবং অন্য প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের সমালোচনা ও তুলনামূলক মূল্যায়ন করে। এছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বাজার নেতা হতে চায় তবে তাকে প্রথমেই ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে।

গ. সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে (From the view point of society): ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে সমাজ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। নিম্নে সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. পণ্যমান সম্পর্কে নিশ্চয়তা (Ensuring quality products): বর্তমান সমাজে ক্রেতাগণ পণ্য মান নিয়ে ভীষণ সজাগ। এখন মানুষ পণ্য মান নিয়ে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করে। ফলে বিপণনকারীকে পণ্যের মান উন্নত ও পণ্য মানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। উৎপাদকরা অনুগত ক্রেতা সৃষ্টি ও তাদের ধরে রাখার জন্য পণ্যের মানোন্নয়নের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ফলে ব্র্যান্ডিং উন্নত ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করে সামাজিক কল্যাণে সহায়তা করে।

২. নতুন পণ্য প্রবর্তন (Introducing new products): বেশিরভাগ উৎপাদক একটি নতুন পণ্য তৈরির স্বপ্ন দেখে থাকে। প্রতিযোগীদের কাছে নেই এমন কোনো নতুন পণ্য উৎপাদনে এবং বিপণনের ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ অনেক বেশি থাকে। সে কারণে উৎপাদকগণ প্রতিনিয়ত সমাজে নতুন নতুন পণ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে উপস্থাপন করছে। ব্র্যান্ডিং অধিকতর উন্নত ও নতুন পণ্য প্রবর্তন করে সামাজিক কল্যাণে সহায়তা করছে।

৩. বিক্রয়কারীর আস্থা (Seller confidence): ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের একটি সামাজিক মূল্য তৈরি হয়। ভালো ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করতে বিক্রয়কর্মীগণ সাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এখানে পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকার কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক সুন্দর থাকে। ট্রেডমার্কের মাধ্যমে ব্র্যান্ডকৃত পণ্যের আইনগত নিরাপত্তা থাকে। প্রতিযোগীরা ব্র্যান্ডকৃত পণ্য নকল করতে পারে না। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানে ভালো কর্মী আকৃষ্ট করতে সহায়তা করে। সর্বোপরি সামাজিকভাবেও বিক্রয়কর্মীরা তাদের কাজের সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

৪. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (Improving standard of living): বিপণন ব্যবস্থা আমাদের দৈনন্দিন ভোগের তালিকায় নিত্য নতুন ব্র্যান্ডের পণ্য যোগান দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মান যত বেশি উন্নত হচ্ছে, ব্র্যান্ডিং ততবেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ব্র্যান্ডিংয়ের ফলে ক্রেতারা সহজেই পণ্য চিহ্নিত করতে পারছে এবং তাদের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডকৃত পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত হচ্ছে। ক্রেতারা সবসময় তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এমন ব্র্যান্ড পছন্দ করে ও বারবার ব্র্যান্ডটি ক্রয়ে আগ্রহী হয়। ফলে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় ।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। যথোপযুক্ত ব্র্যান্ডিং ক্রেতাদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ক্রেতাদের সাথে একটা বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়। তাছাড়া ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে সহজেই প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করা যায়। সর্বোপরি সামাজিকভাবে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কোম্পানিগুলো পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করছে। বিপণনের প্রধান তিনটি গ্রুপ যেমন—ভোক্তা, উৎপাদক এবং সমাজের নিকট ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগী বাজারে টিকে থাকতে হলে পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

ব্র্যান্ডিংয়ের সীমাবদ্ধতা
Limitations of Branding

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকার জন্য ব্র্যান্ডিংয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পণ্য কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্র্যান্ড। ভোক্তা, উৎপাদনকারী ও সমাজ ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উপকৃত হলেও এর বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে ব্র্যান্ডিংয়ের সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. উচ্চমূল্য (High price): ব্র্যান্ডিং এর সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয় মূল্য নিয়ে। বলা হয়ে থাকে ভালো ব্র্যান্ড মানেই উচ্চমুল্য। অনেক সময় সমজাতীয় পণ্যের চাইতে দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে ক্রেতাদেও উচ্চ ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয় করতে হয়। যদিও ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠানকে অনেক খরচ করতে হয়, তথাপি বিপণনকারীগণ ক্রেতাদের আবেগকে পুঁজি করে জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের জন্য উচ্চমূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

২. একচেটিয়া নেতৃত্ব (Lead to monopoly): ভালো ও প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডসমূহ এক ধরনের একচেটিয়া ব্যবসায় পরিণত হয়। এটাকে অন্যভাবে বলা হয় একচেটিয়া ব্র্যান্ড। একচেটিয়া ব্যবসায়ের যে সকল অসুবিধা রয়েছে সেগুলোর প্রতিফলন এখানে পড়ে। একচেটিয়া ব্র্যান্ড অন্য ব্র্যান্ডসমূহকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে নিজেই সমগ্র বাজার দখল করে। ফলে ব্র্যান্ড পণ্যের উচ্চমূল্য নির্ধারণ করে এবং উচ্চ মুনাফা ভোগ করে। একচেটিয়া ব্র্যান্ড ক্রেতাদের বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৩. অন্যান্য পণ্য ক্রয়ে নিরুৎসাহিত (Discouraging from buying others products): ব্র্যান্ডের পণ্যের প্রতি ক্রেতারা বেশি মাত্রায় অনুগত থাকে। এই ক্ষেত্রে ক্রেতারা অন্যান্য ব্র্যান্ডের পণ্য মূল্যায়নের দরকার মনে করে না। ব্র্যান্ডের যারা অন্ধ ভক্ত থাকে তারা বিকল্প কোনো পণ্যের সন্ধান করে না। বাজারে ক্রমাগত যে সকল নতুন পণ্যের আবির্ভাব হয় অনেক ক্রেতাই তাদের প্রচলিত ব্র্যান্ডের বাইরে ঐ সকল নতুন পণ্য ব্যবহার করতে চায় না। এতে অনেক ক্ষেত্রে বাজারে আগত মানসম্মত নতুন পণ্য ব্যবহার থেকে ক্রেতারা বঞ্চিত হয়।

৪. বিভ্রান্তি সৃষ্টি (Create confusion): পণ্য ক্রয়ের সময় ব্র্যান্ডিং নিয়ে ক্রেতারা বিভ্রান্তের মধ্যে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো ক্রেতা বাজারে টেলিভিশন ক্রয়ের সময় বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন ব্র্যান্ড পর্যবেক্ষণ করে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রং, ডিজাইন, মূল্য, সেবা, আকৃতি, রূপরেখা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। প্রত্যেক বিপণনকারী নিজেদের ব্র্যান্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। ফলে পণ্য পছন্দের ক্ষেত্রে ক্রেতারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে।

৫. ব্যয়বহুল (Expensive): ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিষয়। ব্র্যান্ড উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে অনেক অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার পেছনে মেধা ও সময় অনেক বেশি প্রয়োজন। ব্র্যান্ডের পণ্য সাধারণত মজবুত ও টেকসই হয়। এদের উৎপাদন খরচ স্বাভাবিক কারণে বেশি হয়ে থাকে। ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করার জন্য যে অতিরিক্ত খরচ করতে হয় তা যুক্ত হয় পণ্যের দামের সঙ্গে। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা এতোটাই ব্যয়বহুল যে অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য ব্র্যান্ডিং করা সম্ভভ হয় না।

৬. পণ্য পরিবর্তন ঝুঁকি (Risk of product switching): উৎপাদনকারী অনেক সময় তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাগণ সাধারণত বিকল্প পণ্য মূল্যায়ন করে না। অনেক সময় উৎপাদকগণ ক্রেতাদের নিকট ব্র্যান্ডকৃত নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করে থাকে। অন্যদিকে বাজারে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ব্র্যান্ডকৃত পণ্য অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। নতুন ব্র্যান্ডের প্রতি অনেক মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে অনেক নিয়মিত ক্রেতা তাদের বর্তমান ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে নতুন ব্র্যান্ড ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৭. ব্র্যান্ডিং এর আওতা (Scope of branding): বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান চায় তাদের পণ্যকে ব্র্যান্ডিং করতে। তবে কিছু পণ্য আছে যাদের ব্র্যান্ডিং করা যায় না বা করেও খুব একটা লাভ হয় না। যেমন— ফলমূল, শাক-সবজি, তরিতরকারী ইত্যাদি। সাধারণত যে সকল পণ্যের মান খুব বেশি উঠানামা করে তাদের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং খুব কঠিন কাজ। কৃষিজাত পণ্যসমূহের ব্র্যান্ডিং প্রতিষ্ঠানকে সমস্যার মধ্যে ফেলতে পারে। আবার যে সকল পণ্যের বাজার চাহিদা খুব কম তাদের ব্র্যান্ডিং লাভজনক হয় না।

সারসংক্ষেপ:

পণ্য কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং হাতিয়ার হলো ব্র্যান্ডিং। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য ব্র্যান্ডিংয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিপণন, ক্রেতা-বিক্রেতা তথা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভোক্তাদের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং যে সকল ভূমিকা পালন করছে তা হলো: ভোক্তাদের জন্য পণ্য নিশ্চিত করা, মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা, ক্রেতাদের পুনঃক্রয়ে সহায়তা করা, সময় ও শ্রম সাশ্রয় করা, প্রতারণা থেকে রক্ষা ও আইনের সুরক্ষা করা এবং ক্রেতা সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা। বিপণনকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যেমন— পণ্যের ইমেজ সৃষ্টি করা, বাজার সম্প্রসারণ ও বিপণন কৌশল গ্রহণ করা, প্রচার সুবিধা ও পণ্য অবস্থান তৈরি করা, পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও বিক্রয়কারীগণের আস্থা সৃষ্টি করা এবং প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা ইত্যাদি। এছাড়া সমাজের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং যে সকল ভূমিকা পালন করছে তা হলো: পণ্যমান সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করা, নতুন পণ্য উন্নয়ন করা এবং সার্বিকভাবে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিংয়ের অনেক সুবিধা থাকলেও বাস্তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন— পণ্যের উচ্চ মূল্য নির্ধারণ, একচেটিয়া ব্যবসায়ের কুফলসমূহ, ব্র্যান্ডিং নিয়ে ক্রেতারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে এবং এটা অনেক সময় ক্রেতাদের জন্য খুব ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। ব্র্যান্ডিংয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকেই নানা ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য প্রকাশ করেছে। তথাপি বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী ও ব্র্যান্ডিংকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করছে।

পাঠ-১.৫ ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা
Brand Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা কী তা বলতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন; এবং
- বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা হলো একটি প্রক্রিয়া যা সময়ের সাথে সাথে একটি ব্র্যান্ড পণ্যের মান, পণ্যের ইমেজ বজায় রাখতে, পণ্য উন্নত করতে, ব্র্যান্ড সচেতনতা সৃষ্টি করতে পরিচালিত হয়। একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড পরিচালনা করতে এবং তাদের গ্রাহকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে প্রতিনিয়ত নানাবিধ কার্যসম্পাদন করতে হয়। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠুভাবে ব্র্যান্ড পরিচালনার জন্য ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপক যা করে তাই ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি। ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়সাধন হলো ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন বিপণন বিশারদগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। তবে সকলেই যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছে সেটা হলো, ব্র্যান্ড সৃষ্টি এবং ব্র্যান্ড বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল কার্যক্রমের সমষ্টি হলো ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা। বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার বিষয়টি কম-বেশি পরিচিত। বস্তুতপক্ষে একটি কোম্পানির ভবিষ্যত ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। অতীতে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা রীতি, পদ্ধতি, বা কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। বর্তমান ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা কেবল শিল্প, কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্যেই কেন্দ্রীভূত নয়, সরকারি-বেসরকারি, বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক সকল প্রতিষ্ঠানই তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য এটিকে প্রধান কলাকৌশল হিসেবে বিবেচনা করছে।

ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা
Brand Management

ভোক্তাদের চাহিদার সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্র্যান্ড কর্মসূচির বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণকে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা বলে। অন্যভাবে বলা যায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে যখন ব্র্যান্ডকে পরিচালনা করা হয় তাকেই ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা বলে। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য হলো পণ্য বা সেবা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করা। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা একটি ব্র্যান্ডের পরিচয়, মূল্যবোধ এবং ইমেজসহ সার্বিক দিকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত থাকে। Brand management can be referred as influencing the brand image through various tangible and intangible elements.

ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ হলো একটি পণ্য বা সেবার জন্য ব্র্যান্ড সৃষ্টি করা এবং তাকে বাজারে প্রতিষ্ঠা করা। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্রেতা এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ব্র্যান্ডের কিছু দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান উপাদান রয়েছে। একজন ব্যবস্থাপককে এ সকল উপাদানসমূহের প্রতি যথাযথ নজর দিতে হয়। ব্র্যান্ডের দৃশ্যমান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে পণ্য, মূল্য, মোড়ক, বিজ্ঞাপন, প্রতীক, লোগো, রং ইত্যাদি। আবার অদৃশ্যমান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রেতাদের অভিজ্ঞতা অর্জন, ব্র্যান্ড ব্যবহার করে ক্রেতার প্রতিক্রিয়া এবং বর্তমানে ব্র্যান্ডের সাথে ক্রেতার সম্পর্ক। দৃশ্যমান বিষয়গুলো আমাদের ব্র্যান্ডকে স্মরণ করতে সাহায্য করে এবং অদৃশ্যমান বিষয়গুলো ব্র্যান্ডকে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ের বিভিন্ন অ্যাপ্রোচসমূহের সহায়তা নেয়া হয়। মূলতঃ ব্র্যান্ড সৃষ্টি করার চাইতে ব্র্যান্ড বাস্তবায়ন অনেক কঠিন কাজ। একটি ব্র্যান্ডকে বাজারে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়নের সকল কাজের সাথেই ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা জড়িত থাকে। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাদের সাথে লাভজনক সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জনে সহায়তা করা। ব্র্যান্ড কর্মসূচির সর্বক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় নীতিমালা, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। পরিশেষে বলা যায় ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা যায় এবং ব্র্যান্ড সংক্রান্ত সার্বিক কার্যাবলির পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি
Functions of Brand Management

ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা মৌলিক দুইটি কাজ সম্পাদন করে। প্রথমত ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপক ব্র্যান্ড উপাদানগুলো ব্যবহার করে ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরি করে। ব্র্যান্ডের কিছু অভ্যন্তরীণ উপাদান রয়েছে, যেমন— লোগো, নাম, প্রতীক, শ্লোগান ইত্যাদি। এই উপাদানগুলো সঠিকভাবে পোশাকে, পণ্য মোড়কজাতকরণে, যানবাহনে বা দোকানে উপস্থাপন করে যথেষ্ট ভাল ফল লাভ করা যায়। কোথাও 'ফড় রঃ' লেখাটা দেখলে আমাদের নাইকির কথা মনে করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড ইমেজকে ক্রেতাদের মনের মধ্যে অবস্থান করতে সাহায্য করে। এখানে ব্র্যান্ড পার্থক্যকীরণের মাধ্যমে এই কাজটি সফলভাবে করা হয়ে। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্যাবলি ছাড়াও ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার কিছু প্রচলিত কার্যাবলি রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে এই সকল কার্যাবলির বিবরণ দেয়া হলো:

১. ক্রেতা সৃষ্টি ও চিহ্নিতকরণ (Creating and Identifying Customer): ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম আরম্ভ হয় ক্রেতা সৃষ্টি এবং ক্রেতা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে। প্রথমে দেখতে হবে কাদের জন্য ব্র্যান্ড কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং পণ্যের চাহিদা কেমন। উদাহরণস্বরূপ সাবানের কথা বলা যায়। সকল শ্রেণির মানুষ সাবান ব্যবহার করে তাই এর চাহিদা সারা দেশব্যাপী রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের সকল মানুষই সাবানের ক্রেতা। এখন কোনো কোম্পানি যদি কেবল পুরুষ, মহিলা বা শিশুদের জন্য সাবান তৈরি করে তবে অভিষ্ট ক্রেতার সংখ্যা ভিন্ন হবে। প্রথমে ক্রেতাদের ব্যাপ্তি দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। এর পরে ক্রেতাদের বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ বিশ্লেষণ করতে হবে। ক্রেতাদের শ্রেণিগত পার্থক্য ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া ক্রেতাদের চাহিদা ও ক্রয়-অভ্যাস এক রকমের নয়। ব্র্যান্ড ব্যবস্থার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় ক্রেতাদের কেন্দ্র করে।

২. আদর্শ ব্র্যান্ড তৈরি করা (Creating Ideal Brand): ক্রেতা চিহ্নিতকরণের পর ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ হলো আদর্শ ব্র্যান্ড তৈরি করা। এই কার্যক্রমের উপর পুরো ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার সফলতা নির্ভর করে। একটি ভালো ও সৃষ্টিশীল ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারলে তা দিয়ে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার প্রকৃত লক্ষ অর্জন করা যাবে। ব্র্যান্ডের উপর দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান অনেক বিষয় প্রভাব বিস্তার করে। ব্র্যান্ড সৃষ্টির জন্য এ সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় । ব্র্যান্ড সৃষ্টি একটি জটিল বিষয়। একটি ভালো ব্র্যান্ডের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন— ব্র্যান্ড সহজ সরল ও ছোট হবে, এটাকে ইউনিক ও পার্থক্যমূলক হতে হবে, এখানে পণ্য বা সেবার সুবিধাসমূহ বর্ণিত হতে হবে ইত্যাদি। এছাড়াও ব্র্যান্ড সৃষ্টির সময় ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনাকে কিছু মৌলিক উপাদান যেমন— প্রাধান্য, কৃতিত্ব, কল্পনা, বিচার, অনুভূতি, অনুরণন ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

৩. ব্র্যান্ড যোগাযোগ তৈরি করা (Creating Brand Communication): ব্র্যান্ড সৃষ্টির পর ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হলো ক্রেতাদের সাথে ব্র্যান্ডের পরিচয় করিয়ে দেয়া। কেবল মাত্র ব্র্যান্ড তৈরি করলেই হবে না এটাকে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। কারণ দর্শকের কাছে যদি ব্র্যান্ডটি যথাসময়ে না পৌঁছায় তবে ব্র্যান্ডটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জন করতে পারবে না। ব্র্যান্ড যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপক বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণ করতে পারে। ব্র্যান্ড যোগাযোগের উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিলবোর্ড, রেডিও বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, নিউজলেটার, অনলাইন বুলেটিন এবং কোম্পানির সাথে তার কর্মচারীদের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ। ব্র্যান্ড যোগাযোগের লক্ষ্য হলো ব্র্যান্ড এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রাহকদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করা।

৪. ব্র্যান্ড ইমেজ সৃষ্টি (Creating Brand Image): সফল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা নির্ভর করে ব্র্যান্ডিংয়ের উপর, আর ব্র্যান্ডিংয়ের সফলতা নির্ভর করে ব্র্যান্ড ইমেজের উপর। ব্র্যান্ড ইমেজের দুটো দিক রয়েছে, যেমন— দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ব্র্যান্ড ইমেজ। স্বল্পমেয়াদী ব্র্যান্ড ইমেজ সহজেই তৈরি করা যায় কিন্তু এটা দিয়ে বাজারে দীর্ঘদিন অবস্থান করা যায় না। তবে বাজারে ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এবং প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী ব্র্যান্ড ইমেজ সৃষ্টি করতে হবে। একটা রেস্তোরাঁ স্বল্প সময়ে তার প্রতিষ্ঠানের জন্য ইমেজ তৈরি করতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ইমেজ ধরে রাখতে হলে তাকে একটা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনায় ব্র্যান্ড ইমেজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা খুবই জরুরি। একটা ব্র্যান্ডকে তার ক্রেতারা কীভাবে দেখবে তা নির্ভর করে ব্র্যান্ড ইমেজের উপর। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ক্রেতাদের তার ব্র্যান্ড সম্পর্কে নতুন কিছু দিতে চায় তবে তাকে অবশ্যই তার ব্র্যান্ড ইমেজকে মডিফাই করতে হবে। বাজারে গ্রামীণফোন ও টেলিটকের ব্র্যান্ড ইমেজ একরকম নয়। ব্র্যান্ড ইমেজ একদিনেই তৈরি হয় না, এটা তৈরি এবং প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়।

৫. ব্র্যান্ড পজিশনিং সৃষ্টি (Creating Brand Positioning) : ব্র্যান্ড ইমেজ সৃষ্টির সাথে সাথে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার কাজ হলো ব্র্যান্ড পজিশনিং করা। যদি ব্যবস্থাপনা সফল ভাবে ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করতে পারে তবে ব্র্যান্ড পজিশনিং অনেকটা সহজ হয়ে যায়। প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের তুলনায় ভোক্তার মনে ব্র্যান্ডের গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য ও ভাবমূর্তি দ্বারা স্থান করে নেওয়াকে ব্র্যান্ড পজিশনিং বলে। যেমন— গাড়ির জগতে মার্সিডিজ দামি ও বিলাসবহুল গাড়ি হিসেবে, টয়োটা মিতব্যয়ী ও সহজ মেরামতযোগ্য গাড়ি হিসেবে এবং সুজুকী ও মারুতি স্বল্পমূল্যের গাড়ি হিসেবে ক্রেতাদের মনে স্থান করে নিয়েছে। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকগণ ব্র্যান্ড পজিশনিং করে থাকে। এ সকল কৌশলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৈশিষ্ট্যভিত্তিক কৌশল, উপকারিতাভিত্তিক কৌশল, গুণাগুণভিত্তিক কৌশল, ব্যবহারভিত্তিক কৌশল, শ্রেণিভিত্তিক কৌশল, প্রতিযোগিতাভিত্তিক কৌশল ইত্যাদি। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকগণ পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এক বা একাধিক কৌশল গ্রহণ করে সাফল্যের সাথে ব্র্যান্ড পজিশনিং করতে পারে।

৬. ব্র্যান্ড বার্তা (Brand Message): ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান কার্যক্রম হলো ব্র্যান্ডের বার্তা বা মেসেজ তৈরি এবং সেটি যথাযথ স্থানে প্রেরণ করা। ব্র্যান্ড ইমেজ এবং ব্র্যান্ড পজিশনিংকে কার্যকর করার জন্য ব্র্যান্ড মেসেজ সৃষ্টি এবং গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্র্যান্ডিংয়ের ধারণা ও মূল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপকে ব্র্যান্ড বার্তা বা মেসেজ বলা হয়। ছোট একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পুরো ব্র্যান্ডকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করে। এ সকল বার্তাসমূহ খুবই দক্ষতার সাথে সৃষ্টি করতে হয়। এ বার্তাগুলো ব্র্যান্ড পজিশনিংকে খুব শক্তিশালী করে। ব্র্যান্ড বার্তা বা মেসেজ প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড ভ্যালুকে বৃদ্ধি করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে। ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগের প্রধান ভাষা হলো ব্র্যান্ড মেসেজ। নাইকির ব্র্যান্ড মেসেজ হলো "লঁংঃ ফড় রঃ", ফেয়ার এ্যান্ড লাভলীর ব্র্যান্ড মেসেজ হলো "গায়ের রং ফর্সা হবে"। ম্যাকডোনাল্ডস ও পেপসি কোকাকোলার মত বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো ম্যাসেজ বা ব্র্যান্ড বার্তা দিয়ে তাদের ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড পজিশিনিং করতে পেরেছে। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনাকে ব্র্যান্ড বার্তা তৈরি করার পর ক্রেতাদের নিকট বার্তাটি সঠিক সময়ে প্রেরণের উদ্যোগে গ্রহণ করতে হবে। বার্তা প্রেরণের জন্য বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

৭. ব্র্যান্ড কনটেন্ট (Brand Content): ব্র্যান্ডের জন্য যে সকল কাজ করা হয় সেগুলোর প্রায় সবই একটি ব্র্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে। ব্র্যান্ড শ্লোগান বা ব্র্যান্ড বার্তা এগুলো সরাসরি ব্র্যান্ডের সাথে জড়িত। ভোক্তাগণ মনে করে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রমোশনাল কার্যক্রমে কোলমাত্র তাদের ব্র্যান্ডকেই ফোকাস করে। ফলে এটা কেবল প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক অ্যাপ্রোচ। বর্তমানে ক্রেতারা এর বাইরেও অনেক কিছু পেতে চায়। যার কারণে প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড উপস্থাপনের পাশাপাশি কার্যকর এবং উপকারী কিছু কনটেন্ট তৈরি করে থাকে। এই কনটেন্টগুলো ক্রেতাদের ভীষণভাবে আকর্ষণ করে, সাথে সাথে ব্র্যান্ডের পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। ভালো মানের কনটেন্ট ছাড়া কোনভাবেই ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ব্র্যান্ডের কনটেন্ট যত ভালো ও সৃষ্টিশীল হবে প্রতিষ্ঠান তত দ্রুত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে। কোনো প্রতিষ্ঠান তার পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের পাশাপাশি ব্র্যান্ডের উপকারিতা, ব্যবহার উপযোগিতা, কোনো তথ্যবহুল বিষয়, কোনো গল্প বা মজাদার অভীজ্ঞতার কথা বিভিন্ন মাধ্যমে টার্গেট ক্রেতাদের কাছে শেয়ার করে। এ বিষয়গুলো ব্র্যান্ডিংয়ের কনটেন্ট হিসেবে কাজ করে। একটি প্রতিষ্ঠান মধু উৎপাদন করে তা বিশেষ ব্র্যান্ড নামে বাজারে বিক্রয় করতে পারে। এখন প্রতিষ্ঠানটি মধু ব্র্যান্ডিংয়ের পাশাপাশি মধুর জন্য কিছু কনটেন্ট তৈরি করতে পারে, যেমন— মধুর গুণাবলী, সংরক্ষণ পদ্ধতি, কার্যকারিতা,উপকারিতা, নানাবিধ ব্যবহার ইত্যাদি।

৮. ব্র্যান্ড সুরক্ষা (Brand Protection): ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ব্র্যান্ড সুরক্ষা। অনেক বিনিয়োগ ও কষ্ট করে একটি ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখন এই ব্র্যান্ডটিকে যথাযথ সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। প্রথমত, প্রতিযোগীদের কাছ থেকে এটাকে সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্র্যান্ডটিকে সুরক্ষা প্রদান করা যায়। অনেকেই মনে করে যে ব্র্যান্ড সুরক্ষা শুধুমাত্র ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের সাথে জড়িত। কিন্তু আসলে তা নয়, ব্র্যান্ড সুরক্ষা ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্র্যান্ডের অখণ্ডতা, মান, খ্যাতি ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য ব্র্যান্ড সুরক্ষা একটি ব্যাপক কৌশল। ডিজিটাল বিপণন ব্যবস্থায় ব্র্যান্ড লঙ্ঘন অত্যন্ত সহজ বিষয়। বর্তমানে ব্র্যান্ড সুরক্ষা ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকদের কাছে বিরাট হুমকি ও চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এখন কিছু ব্র্যান্ড সুরক্ষা সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে যারা প্রতিষ্ঠানকে ব্র্যান্ড সুরক্ষা প্রদান করতে সহায়তা করে। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এটাকে টিকিয়ে রাখা কষ্টের বিষয়। ব্র্যান্ডের নাম, প্রতীক, ডিজাইন, লোগো ইত্যাদি বিষয়গুলো জালিয়াতি করে অনেক প্রতিষ্ঠান এগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এছাড়া নিরাপত্তা সীল, লেবেলিং, ঔষধ, প্রসাধনী দ্রব্য ইত্যাদি নিয়মিতভাবে জালিয়াতির শিকার হচ্ছে। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনাকে এ সকল বিষয় থেকে সাবধানে থাকতে হবে। আইন কানুনের সহযোগিতা এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্র্যান্ড সুরক্ষা পেতে পারে।

ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার প্রধান দুইটি কাজ হলো ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরি করা এবং ব্র্যান্ডের ইমেজকে ক্রেতাদের মনের মধ্যে অবস্থান করানো। তাছাড়া ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনাকে আরো কিছু কার্যাবলি হাতে নিতে হয়। যেমন— আদর্শ ব্র্যান্ড তৈরি করে সেই ব্র্যান্ডকে যথাযথভাবে ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করা, ব্র্যান্ড তৈরির সময় ব্র্যান্ডের উপাদানসমূহ সঠিকভাবে বিবেচনা করা, ব্র্যান্ডের ইমেজ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্র্যান্ডের পজিশনিং করা, ব্যবস্থাপককে ব্র্যান্ডের জন্য একটি আবেগময় বার্তা তৈরি করা এবং সাথে সাথে সৃষ্টিশীল কনটেন্ট তৈরি করা। পরিশেষে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডটিকে সুরক্ষা প্রদান করা।

বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের সম্পর্ক

Relationship between Marketing and Branding

বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। অনেকেই বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা না করে দুটো বিষয়কে অভিন্নভাবে আলোচনা করেছে। আসলে এদের মধ্যে কিছু মিল থাকলেও বাস্তবে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং এবং বিপণনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। তবে এ সকল বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আমাদের প্রথমে জানা দরকার বিপণন এবং ব্র্যান্ডিংয়ের প্রকৃত অর্থ।

ভোক্তার প্রয়োজন ও অভাবের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বিনিময় সম্পর্কিত সকল মানবীয় কার্যাবলির সমষ্টিকে বিপণন বলে। অন্যদিকে ব্র্যান্ড বলতে যে কোন চিহ্ন, প্রতীক, ডিজাইন, নাম বা এগুলোর সংমিশ্রণকে বোঝায় যা প্রতিযোগী পণ্য বা সেবা থেকে পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ ব্র্যান্ডের প্রতি ভোক্তাদের বিশেষ আকর্ষণ থাকে। ব্র্যান্ড বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ব্র্যান্ডিং বলা হয়। বিপণন এবং ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে একটি ক্রিয়াগত সম্পর্ক থাকলেও কার্যক্ষেত্রে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নের আলোচনায় বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে পার্থক্যমূলক বিষয়গুলোর বিবরণ দেয়া হলো:

১. বিপণনের আওতা অনেক বিস্তৃত। পণ্য বিপণনের একটি অংশ হলো ব্র্যান্ডিং। বিপণন প্রক্রিয়ায় ব্র্যান্ডিং ছাড়াও অনেক ধরনের কার্যক্রম রয়েছে। এসকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা-আলাদা ব্যবস্থাপক রয়েছে। যেমন— ব্র্যান্ডিংয়ের দায়িত্ব পালন করে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপক।

২. বিপণনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে ক্রেতা সন্তুষ্টির উপর। তাই এখানে বলা হয়ে থাকে ক্রেতাই রাজা। ব্র্যান্ডিংয়ে ক্রেতাদের পণ্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করানো হয়। ব্র্যান্ড পজিশনিং এখানে বড় বিষয় এবং এটার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

৩. বিপণন একটি প্রক্রিয়া যেখানে পণ্য, মূল্য, বণ্টন, প্রচার ইত্যাদির সমন্বয় করা হয়। এই সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিপণন পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিং একটি প্রক্রিয়া যেখানে নাম, চিহ্ন, প্রতীক, ডিজাইন ইত্যাদির সমন্বয় করা হয়। এ সকল সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যান্ড পরিচালিত হয়।

৪. বিপণনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা খুব বেশি লক্ষ করা যায়। সময় ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বিপণন কলাকৌশলসমূহ দ্রুত পরিবর্তন করতে হয়। তবে ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায় না। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ব্র্যান্ড সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন করতে হয়। মূলতঃ এটা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।

৫. বিপণন প্রক্রিয়া ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। সকল শ্রেণির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বিপণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। অন্যদিকে সকল শ্রেণির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যসমূহকে ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় নিয়ে আসেনা। বিশেষ করে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্র্যান্ডিংকে এড়িয়ে চলে।

৬. এদের মধ্যে উদ্দেশ্যজনিত পার্থক্য দেখা যায়। বিপণনের উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ এবং পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে বাজার বিস্তৃতিকরণ। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য হলো পণ্যের ভ্যালু, আনুগত্যতা এবং পজিশনিং সৃষ্টি করা।

৭. বিপণন কার্যক্রমের ব্যবসায়িক ফলাফল হলো পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি এবং চাহিদার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা। এখানে প্রকাশ করা হয় যে, কেন ক্রেতাদের পণ্য ক্রয় করা উচিত। ব্র্যান্ডিং পণ্য ও ক্রেতার মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এখানে প্রকাশ করা হয় যে, কেন গ্রাহকগণ পণ্যটি বিশ্বাস ও গ্রহণ করবে।

৮. বিপণনে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সঠিক সময়ে সঠিক পণ্যটি সঠিক ক্রেতার নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। পণ্য থেকে আয় বৃদ্ধি করাই এদের প্রধান কাজ। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিং পণ্য পরিসেবা দিয়ে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে চায়। ব্র্যান্ডিংয়ে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৯. বিপণনে মূলত বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এখানে একটি কার্যকর সংযোগ তৈরির চেষ্টা করা হয়, যার মাধ্যমে ক্রেতা সচেতনতা তৈরি করা যায়। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি তৈরি করা হয়। এখানে একটি মানসিক সংযোগ তৈরির মাধ্যমে পণ্য পার্থক্যকীকরণ করা হয়।

ব্র্যান্ডিংয়ের এবং বিপণনের মধ্যে একটা বিষয় দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক সৃষ্টি করে আসছে সেটা হলো বিপণন কার্যক্রম প্রথমে শুরু হয় না, ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম প্রথমে শুরু হয়। অনেকের মতে ব্র্যান্ডিং বিপণনের একটি অংশ, সেক্ষেত্রে বিপণন প্রক্রিয়া আগে শুরু হয়ে থাকে। আবার অনেকেই মনে করে থাকে বিপণন সব সময় ব্র্যান্ডকে অনুসরণ করে। একটা ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাই ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়া আগে শুরু হয়ে থাকে। আবার যদি কোনো ব্র্যান্ড না থাকে তবে কোনো বিপণনের প্রয়োজন হয় না। যদি ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো সামনের দিকে অগ্রসর হতে চায় তবে তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের সহযোগিতা নিতে হয়। পরিশেষে বলা যায়, ব্র্যান্ডিং ও বিপণন ব্যবসায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক ব্যবসায়ে দুটোরই গুরুত্ব অপরিসীম। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি দিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়।

সারসংক্ষেপ:

ভোক্তাদের চাহিদার সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে ব্র্যান্ড কর্মসূচির বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণকে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা বলে। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা মৌলিক দুটি কাজ সম্পাদন করে। প্রথমত, এটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড উপাদানগুলোকে ব্যবহার করে ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডের ইমেজকে ক্রেতাদের মনের মধ্যে অবস্থান করতে সাহায্য করে। এছাড়াও ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি হলো, ক্রেতা সৃষ্টি ও চিহ্নিতকরণ, আদর্শ ব্র্যান্ড তৈরি করা, সুষ্ঠু ব্র্যান্ড যোগাযোগের ব্যবস্থা করা, ব্র্যান্ড ইমেজ সৃষ্টি করা, ব্র্যান্ড পজিশনিং করা, ব্র্যান্ডের বার্তা ও ব্র্যান্ডের কনটেন্ট তৈরি করা এবং ব্র্যান্ডের সুরক্ষা প্রদান করা। অন্যদিকে বিপণন ও ব্র্যান্ডের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও এদের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন— ব্র্যান্ডিং পণ্যের পরিচয় তৈরি ও ভ্যালু তৈরি করে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম ও সামষ্টিক বিষয়। ব্র্যান্ডিং একটা গতিপথ চিহ্নিত করে, ক্রেতার আনুগত্য সৃষ্টি ও মানসিক সংযোগ তৈরি করে। বিপণন গ্রাহকদের নিকট পণ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে, একটি স্বল্পমেয়াদী প্রক্রিয়া, ব্যষ্টিক বিষয়, কৌশলকে বর্ণনা করে, ভ্যালুকে ব্যবহার করে, এটি একটি যৌক্তিক বিষয় এবং একটা সমন্বিত কার্যক্রম। ব্র্যান্ডিংয়ের এবং বিপণনের মধ্যে একটা বিষয় দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক সৃষ্টি করে আসছে সেটা হলো বিপণন কার্যক্রম প্রথমে শুরু হয় না ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম প্রথমে শুরু হয়। ব্র্যান্ডিং ও বিপণন ব্যবসায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক ব্যবসায়ে দুটোর গুরুত্বই অপরিসীম। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি দিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়।

পাঠ-১.৬ ব্র্যান্ডের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
Brand Influencing Factors

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ডের বিপণন মিশ্রণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- ব্র্যান্ড উপাদানসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

একটি ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে বৃহত্তর পরিবেশের পরিমন্ডলে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ব্র্যান্ড সৃষ্টি ও বাস্তবায়নে অনেক উপাদান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিছু উপাদান ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আবার কিছু উপাদান ব্যবস্থাপকের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। সামগ্রিক পরিবেশের সাথে সমন্বয়মূলক ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম গ্রহণের উপর বিপণন কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে। এজন্য ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে সামগ্রিক পরিবেশ এবং বিপণন পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে অবগত হতে হয়। বিশেষ করে ব্র্যান্ড উপাদানের বিষয়গুলো সর্বদায় পরিবর্তনশীল। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড উপাদানের পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো অনিশ্চয়তা, হুমকি এবং সুযোগের সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোর পূর্বানুমান সঠিক হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অন্য দিকে ব্র্যান্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রতিষ্ঠানের নীতি, কৌশল ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দ্বারা একটি ব্র্যান্ড ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজ হলো ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করা এবং এদের প্রভাব থেকে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে মুক্ত করা।

ব্র্যান্ডের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
Brand Influencing Factors

প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডটি ক্রেতাদের মনের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। মানুষ কীভাবে ব্র্যান্ডকে মূল্যায়ন এবং অনুভব করবে তা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ব্র্যান্ডিংকে পণ্য কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্র্যান্ডিংয়ের ফলে একদিকে যেমন ভোক্তারা উপকৃত হচ্ছে, তেমনি বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা অনেক কষ্টসাধ্য এবং একটি সৃষ্টিশীল কাজ। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করে একে টিকিয়ে রাখা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। যে কারণে ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা এবং সৃষ্টির পূর্বেই অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার প্রয়োজন। কিছু বিষয় আছে যা বিবেচনা না করে ব্র্যান্ড সৃষ্টি করলে পরবর্তীতে সেই ব্র্যান্ড প্রতিযোগী বাজারে অবস্থান গ্রহণ করতে পারেনা। তাই ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। নিম্নে ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয় (Internal Factors of the Company): প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু বিষয় আছে যা ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ব্র্যান্ড সৃষ্টির পূর্বেই এই উপাদানসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন অন্যথায় এগুলো ব্র্যান্ডের কার্যকারিতায় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো হলো মিশন, লক্ষ, উদ্দেশ্য, ভ্যালু সিস্টেম, প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি, সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা, বিপণন গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি।

ক. কোম্পানির মিশন ও ভিশন (Mission and Vision of the Company): যদি কোনো কোম্পানি তাদের মিশন ও ভিশনের ধারণা দিতে ব্যার্থ হয় তবে এটা ব্র্যান্ডের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এখন কোম্পানির মিশন বিবৃতিতে বলা হলো যে, তারা বাজার নেতা হতে চায়, তবে এটির প্রতিফলন তার ব্র্যান্ডের মধ্যে প্রতিফলিত হতে হবে। আবার কোম্পানির ভিশন হলো যে, তারা ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করবে। কিন্তু ক্রেতারা যদি এই ব্র্যান্ড থেকে প্রত্যাশিত

সেবা না পায় তবে ব্র্যান্ডটি ক্রেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে ব্র্যান্ড উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা বিবেচনায় রাখতে হবে যে ব্র্যান্ডটি কোম্পানির মিশন ও ভিশনের সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ।

খ. কোম্পানির মূল্যবোধ (Values of the Company): প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ থাকে যেমন— সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, দক্ষতা, নেতৃত্ব, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি। একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড নিয়ে বাজারে অনেক ধরনের সুনাম, দুর্নাম, অপবাদ ইত্যাদি থাকতে পারে। এ সকল বিষয়গুলো ব্র্যান্ডের উপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বাজারে কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ প্রচলিত থাকলে ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান যতই বিনিয়োগ করুক না কেন ব্র্যান্ডটি কোনো মতেই সফলতা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সততা বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যদি বাজারে যথেষ্ট সুনাম থাকে তবে তাদের ব্র্যান্ডটি সহজেই বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

গ. কোম্পানির সংস্কৃতি (Culture of the Company): কোম্পানির সংস্কৃতি হলো ব্র্যান্ড সাফল্যের একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি সাধারণ লক্ষ অর্জনের জন্য কর্মীদের একসাথে কাজ করার উপায়কে আকার দেয় এবং কর্মী সন্তুষ্টি ও উৎপাদনশীলতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। ব্র্যান্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোম্পানির সাংস্কৃতি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ব্র্যান্ডের ধারণা এবং উন্নয়ন প্রধানত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছ থেকেই আসে। এ ব্যাপারে কর্মীদের অভিজ্ঞতার মতবিনিময় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতি ব্র্যান্ড বিস্তার ও গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সনাতন কোম্পানি সংস্কৃতিতে কোন সময় সুষ্ঠু ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে না।

ঘ. অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা (Internal Strength and Weakness): ব্র্যান্ডের সম্ভাবনা উন্মোচন করতে অভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে তাদের মূল কার্যক্রম শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। একটি কার্যকর ব্র্যান্ড পরিকল্পনা তৈরি করতে, প্রথমে নিজের প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধাগুলো খুঁজে বের করতে হবে। গবেষণার পরিবর্তে অনুমানের উপর ভিত্তি করে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিৎ নয়। ধরা যাক কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিংয়ের সকল বিষয় অনুকূলে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয় প্রতিকূলে রয়েছে। এক্ষেত্রে একজন ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকের পক্ষে ব্র্যান্ড সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন কোনো মতেই সম্ভব হবে না। ফলে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্রগুলো সনাক্ত করতে হবে এবং সেভাবে ব্র্যান্ডিং কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. প্রতিযোগিতা (Competition) : ব্র্যান্ডিংয়ের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয় প্রতিযোগীদের কার্যক্রম দ্বারা। প্রথমত, ব্র্যান্ড সৃষ্টির সময় যারা বাজারে প্রতিযোগী রয়েছে তাদের সার্বিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে হয়। এদের সফলতার কারণসমূহ এবং দূর্বলতার দিকগুলোর প্রতি যথাযথ আলোকপাত করতে হয়। প্রতিযোগীদের আচার আচরণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রতিযোগীদের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ব্র্যান্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত ও কৌশলসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ব্র্যান্ড সৃষ্টির পর প্রতিযোগীরা নতুন নতুন কী ধরনের কৌশল গ্রহণ করছে তার সার্বক্ষণিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারণ প্রতিযোগীদের নতুন চিন্তাভাবনা ও ব্র্যান্ডিং কৌশল ক্রেতাদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করতে পারে। তাই ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগীদের অবস্থান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

২. বিপণন মিশ্রণ (Marketing Mix): ব্র্যান্ডের সাথে বিপণন মিশ্রণের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বিপণন কৌশলকে উন্নত করতে ব্র্যান্ডকে ব্যবহার করা হয়। পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধিতে ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্রেতারা যখন কোনো পণ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন পছন্দের ব্র্যান্ডটি তাদের মনের মধ্যেই থাকে। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিং সৃষ্টির সময় বিপণন মিশ্রণ নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যে কোনো ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয়সমূহ বিপণন মিশ্রণের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা সেটা বিবেচনা করে। ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিপণন মিশ্রণ অপরিহার্য। একটি ব্র্যান্ডকে গাইড এবং কার্যকর করতে প্রতিষ্ঠানকে বিপণন মিশ্রণের উপর নির্ভর করতে হয়। বিপণন মিশ্রণের সকল উপাদানের সাথে সমন্বয় করে ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। ব্র্যান্ডিংয়ের উপর কীভাবে বিপণন মিশ্রণের বিভিন্ন উপাদান প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. পণ্য (Product): মানুষের অভাব মোচন বা চাহিদার সন্তুষ্টি বিধানে সক্ষম এমন বস্তু, সেবা, স্থান, ব্যক্তি, ধারণা, সংগঠন ইত্যাদি সব কিছুকেই পণ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে ব্র্যান্ডিং হলো একটি নাম, প্রতীক, লোগো বা ডিজাইন তৈরি করার প্রক্রিয়া যা একটি কোম্পানি বা পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। বিভিন্ন ধরনের পণ্য রয়েছে যাদের ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন— শিল্প পণ্য বা ভোগ্য পণ্যের ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়। আবার

সেবা পণ্যের ব্র্যান্ডিং ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। অন্যদিকে দেখা যায় যে, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে খাদ্য দ্রব্যের ব্র্যান্ডিংয়ের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সে কারণে ব্র্যান্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির পণ্যকে বিবেচনায় আনতে হয়।

খ. মূল্য (Price): বিপণন মিশ্রণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মূল্য। প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের মূল্য কৌশল গ্রহণ করে থাকে। এই মূল্য কৌশলসমূহ একদিকে যেমন ক্রেতাদের প্রভাবিত করে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিংকেও প্রভাবিত করে। পণ্যের উচ্চমূল্য বা নিম্নমূল্য উভয় মূল্য কৌশল দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং প্রভাবিত হয়। কিছু পণ্য রয়েছে যাদের উচ্চমূল্য ক্রেতা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে আবার কিছু পণ্যের উচ্চমূল্য ক্রেতা গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করে। বিশেষ করে ফ্যাশন দ্রব্যের ব্র্যান্ডিং মূল্য কৌশল দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। প্রতিষ্ঠানের মূল্য কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের ব্র্যান্ডিং করা হয়। ক্রেতাদের কাছে ব্র্যান্ডের গুণগতমান ও প্রতিপত্তি বোঝানোর জন্য ভিন্ন ধরনের মূল্য কৌশল গ্রহণ করতে হয় ।

গ. স্থান (Place): ক্রেতা যখন যেখানে পণ্যটি কিনতে চায় সেখানে পণ্যটি নিশ্চিত করার নামই হলো স্থান। বিপণন মিশ্রণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান স্থান। ব্র্যান্ডের সাথে পণ্য বণ্টনে নিযুক্ত সদস্যগণ যেমন— খুচরা কারবারি, পাইকারি কারবারি, এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর ইত্যাদির সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতার অনেকাংশেই এ সকল প্রণালীর সদস্যদের উপর নির্ভর করে। প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী ব্র্যান্ড সৃষ্টি করুক না কেন ব্র্যান্ডের সফলতা ও ব্যর্থতা বহুলাংশে বণ্টন প্রণালীর সদস্যদের উপর নির্ভর করে। খুচরা ব্যবসায়ীরা যদি কোনো ব্র্যান্ডের প্রতি নেতিবাচক মন্তব্য প্রদান করে তবে ক্রেতাগণ তাদের ক্রয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বণ্টন পদ্ধতি যেমন— ব্যাপক বণ্টন, নির্বাচিত বণ্টন বা সীমিত বণ্টন ইত্যাদি কোনো ব্র্যান্ডের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ. প্রসার (Promotion): ব্র্যান্ড প্রমোশন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্র্যান্ড সম্পর্কিত সকল তথ্য ভোক্তাদের অবহিত করে উক্ত ব্র্যান্ডটি ক্রয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা। একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড সৃষ্টি করার পর যদি সেটাকে যথাযথভাবে ক্রেতাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা না হয় তবে ব্র্যান্ডটি তার কার্যকারিতা হারাবে। ক্রেতাদের নিকট ব্র্যান্ড সম্পর্কিত তথ্য ফলপ্রসূভাবে উপস্থাপনের জন্য বিপণনকারী কর্তৃক ব্যবহৃত বিপণন প্রমোশনের উপাদানগুলো হলো বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিক বিক্রয়, জনসংযোগ, বিক্রয় প্রসার ও প্রত্যক্ষ বিপণন। সমন্বিত বিপণন যোগাযোগের সকল হাতিয়ারগুলোর দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুস্পষ্ট এবং আবেদনমারী ব্র্যান্ড সম্পর্কিত একটি বার্তা একযোগে ভোক্তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। সে কারণে ব্র্যান্ডের প্রমোশন যদি সঠিক না হয় তবে ব্র্যান্ডটি ক্রেতাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

ঙ. মানুষ (People): ব্র্যান্ড প্রণয়নে মানবীয় সম্পদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ব্র্যান্ডিংয়ের অনেক কলাকৌশল গ্রহণের বিষয়ে অনেকাংশ নির্বাহীদের মন মানসিকতা ও তাদের ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের মধ্যে ব্র্যান্ডিং নিয়ে ঐক্যমত না থাকলে সঠিকভাবে ব্র্যান্ড উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মী, ক্রেতা এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উচ্চ মানের পারস্পারিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সংশ্লিষ্ট মানুষদের জন্য একটি ইতিবাচক এবং স্মরণীয় অভিন্নতা তৈরি করা। একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র দুর্বল সেবা প্রদানের জন্য ৮০% ভাগ ক্রেতা তাদের ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন ধরনের আচরণ ও কার্যক্রম দ্বারা ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত হয়। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রচলিত ধ্যান ধারণার উপর ব্র্যান্ডিংয়ের কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল।

চ. বস্তুগত অবস্থা (Physical Evidence): ব্র্যান্ড সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত অবস্থা প্রভাব বিস্তার করে থাকে, প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যময় বিষয়গুলো ব্র্যান্ডকে প্রভাবিত করে। কোনো একটি হাসপাতালের অবকাঠামো যদি খুবই দুর্বল হয় তবে এর ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ কোনো কাজে আসবে না। যে সকল হোটেলের রান্নার স্থান খুবই অপরিষ্কার তাদের পক্ষে সুষ্ঠু ব্র্যান্ড উন্নয়ন কোনো মতেই সম্ভব নয়। যদি ক্রেতার মনে প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত অবস্থাটি নেতিবাচক হয়ে থাকে, অনেক সময় ব্র্যান্ডের জন্য ব্যাপক প্রমোশনাল কর্মসূচি গ্রহণ করেও কোনো ভাল ফল লাভ করা যায় না। বাস্তবে দেখা যায় যে, পুরাতন ও ভাঙ্গাচোরা গাড়ির বহর দিয়ে কোনো পরিবহন কোম্পানি তাদের ব্র্যান্ডকে বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। ফলে ব্র্যান্ড উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত অবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ছ. প্রক্রিয়া (Process): ব্র্যান্ড সৃষ্টির জন্য অনেকগুলো উপাদানের সুষ্ঠু সমন্বয় করতে হয়। এখানে বিশেষ ধরনের কারিগরি, মানসিক ও ধারণাগত দক্ষতার প্রয়োজন হয়। মূলতঃ ব্র্যান্ডিং একটি সৃষ্টিশীল বিষয়। ব্র্যান্ডিং সৃষ্টির ক্ষেত্রে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যে, ব্র্যান্ডিংয়ের কোনো বিষয় দ্বারা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিষয়সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত বা সমালোচিত হচ্ছে কি না। কোনো বিশেষ ব্র্যান্ডিং কৌশল অধিকতর কোনো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করলে বা বিকল্প কৌশল গ্রহণের পথ রুদ্ধ

করলে ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি ও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এটা দ্বারা সৃষ্টি সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন— যদি কোনো জুতা কোম্পানি তাদের জুতার ব্র্যান্ড দিয়ে কোনো খাদ্য দ্রব্য ব্র্যান্ডিং করতে চায় তবে এটা অধিকাংশ ক্রেতার মনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে। এক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিংয়ের পদ্ধতিগত ও প্রক্রিয়াগত বিষয়সমূহ ব্র্যান্ডের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

৩. ব্র্যান্ড উপাদান (Brand Factors): ব্র্যান্ড উপাদানের অনেক বিষয় রয়েছে যা ব্র্যান্ডের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যখন কোনো ব্র্যান্ড সৃষ্টি করা হবে তখন ব্র্যান্ড উপাদানের এই বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ব্র্যান্ড উপাদানের এ সকল বিষয়গুলো ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একটি ব্র্যান্ডের সফলতা নির্ভর করে অনেকগুলো বিষয়ের উপর। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড সফলতার উপাদানগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। এই উপাদানগুলো নানাভাবে ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই উপাদানগুলো একটি আর একটির সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। ব্র্যান্ডিংয়ের এ সকল উপাদানগুলো কেবল ব্র্যান্ডকেই নয় বরং ব্র্যান্ডের ক্রেতাকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। ব্র্যান্ড বিশেষজ্ঞগণ ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো দশটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে। ব্র্যান্ড উপাদানের বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. গ্রাহকদের স্বচ্ছতা (Customer Clarity): গ্রাহকদের ব্র্যান্ড সম্পর্কে ধারণা ও স্বচ্ছতা ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ক্রেতাদের মনে কোনো একটি ব্র্যান্ড নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দেয়। ব্র্যান্ডের সকল বিষয় নিয়ে ক্রেতাদের স্বচ্ছ ধারণা সবসময় থাকে না। ব্র্যান্ডের সকল গল্প বা বর্ণনাকে ক্রেতারা অনেক সময় বিশ্বাস করতে চায় না। ফলে ক্রেতাদের মনে ব্র্যান্ড সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রেতাদের ব্র্যান্ড সম্পর্কে এমন একটা পরিষ্কার ধারণা তৈরি করতে হবে যা ব্র্যান্ড বর্তা বা শ্লোগানের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়। গ্রাহকদের নিকট সরাসরি ব্র্যান্ড উপস্থাপন অথবা ক্রেতার সাথে সরাসরি ব্র্যান্ড নিয়ে আলোচনা ব্র্যান্ড স্বচ্ছতা সৃষ্টি করে। গ্রাহকদের আচরণ, বয়স, শিক্ষা, আয়, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের নিকট ব্র্যান্ড উপস্থাপন করা হয়। ব্র্যান্ডের সম্পর্কে ক্রেতাদের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা তৈরি না হলে ব্র্যান্ডটি বাজারে সফলতা লাভ করতে পারবে না।

খ. ব্র্যান্ড পজিশনিং (Brand Positioning): আমরা যদি প্রশ্ন করি বিভিন্ন বিকল্প ব্র্যান্ড থেকে ক্রেতারা কীভাবে একটি ব্র্যান্ডকে বেশি পছন্দ করে? এ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজলে যা পাওয়া যাবে তা হলো ব্র্যান্ড পজিশনিং। পণ্য বিক্রয় করতে পারলেই প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ হয়ে যায় না। প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে ঐ পণ্যটি ক্রেতারা নিয়মিত ক্রয় করছে কিনা। ঐ পণ্যটি ভোক্তাদের মনে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে অথবা পণ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা কী, সে সম্পর্কে বিপণনকারীকে অবগত হতে হয়। বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মাধ্যমে ক্রেতাদের মনের মধ্যে পণ্যটির অবস্থান তৈরি করাতে হবে। ক্রেতাদের সাথে কথা বলে জানতে হবে কেন তারা পণ্যটি পছন্দ করে অথবা কেন তারা পণ্যটি অপছন্দ করে। প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের সাথে এই ব্র্যান্ডের পার্থক্যমূলক বিষয়গুলো কী? প্রতিষ্ঠান যদি সঠিকভাবে ব্র্যান্ড পজিশনিং করতে না পারে তবে সেই ব্র্যান্ডটি বাজারে সফলতা লাভ করতে পারবে না।

গ. ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্ব (Brand Personality): ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্ব হল সেই গুণাবলি যা আপনার আছে এবং যা আপনাকে আপনার গ্রাহকদের সাথে সংযুক্ত করতে পারে। এটি ব্র্যান্ডকে এমনভাবে প্রকাশ করে যেন এটি একটি সত্ত্বার পরিবর্তে একজন ব্যক্তি। বিপণন কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্বের চরিত্র ফুটে ওঠে। ব্যক্তির মত ব্র্যান্ডকেও আধুনিক, সেকেলে, দেশি, বিদেশি, জীবন্ত ইত্যাদি বলে মনে হতে পারে। উসেইন বোল্টকে নাইকির জুতার বিজ্ঞাপনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে যদি একজন বৃদ্ধ ও রুগ্ন মানুষকে দিয়ে উপস্থাপন করা হতো তবে এই জুতার ব্যক্তিত্ব দুই ভাবে প্রকাশ পেতো। ভোক্তদের আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে কিছু ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্ব মিলে যায় বলে ক্রেতারা ঐ পণ্যটি ক্রয় করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা কৌশলের মাধ্যমে এই ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে থাকে। বিজ্ঞাপনে মডেল তারকারা তাদের কণ্ঠস্বর বা অভিনয়ের মাধ্যমে যে অনুভূতি প্রকাশ করে যা ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রভাহিত হয়। ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্ব যদি ক্রেতাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যার্থ হয় তবে ব্র্যান্ডটি ক্রেতা গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

ঘ. ব্র্যান্ডের উদ্দেশ্য (Brand Purpose): যদি আমরা সাধারণভাবে প্রশ্ন করি কেন ক্রেতারা একটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডকে পছন্দ করবে এবং সেই ব্র্যান্ডের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য দেখাবে। সচেতন ক্রেতারা বিবেচনা করে ব্র্যান্ডটি তাদের উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে কিনা। তাই ব্র্যান্ডকে তার উদ্দেশ্যসমূহকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ব্র্যান্ডটি তার প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের চাইতে অতিরিক্ত কী ধরনের সুবিধাসমূহ প্রদান করবে বা করছে তার প্রতিফলন থাকতে

হবে। ব্র্যান্ডটিকে কেবলমাত্র পণ্য কেন্দ্রিক হলে চলবে না বরং এর সাথে সাথে ক্রেতা ও সমাজ কেন্দ্রিক হতে হবে। অনেক ব্র্যান্ড স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ১০% মূল্য ছাড় দিয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো ব্র্যান্ড ঈদের সময় গরীব ও দুঃস্থ শিশুদের বিনা মূল্যে জুতা উপহার দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে ব্র্যান্ডগুলো তাদের উদ্দেশ্যকে প্রকাশিত করতে পারে যে তারা কেবল মুনাফা কেন্দ্রিক নয় অধিকিন্তু তারা ক্রেতা ও সমাজ কেন্দ্রিক। ব্র্যান্ডের উদ্দেশ্য যদি কেবল মাত্র মুনাফা কেন্দ্রিক হয় তবে ব্র্যান্ডটি ক্রেতা গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।

ঙ. ব্র্যান্ড ভ্যালু (Brand Value): ব্র্যান্ড ভ্যালু বলতে এমন বৈশিষ্ট্যের অনন্য সেট বোঝায় যা একটি ব্র্যান্ড কীভাবে বাজারে অবস্থান করবে, কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কীভাবে সেখানে অবদান রাখবে। একটি প্রতিষ্ঠান তার ব্র্যান্ড ভ্যালু বিবৃতিতে ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। বর্তমানে সনাতন ব্র্যান্ড ভ্যালুগুলো খুব বেশি কার্যকর হয় না। যেমন— প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি যদি হয় "আমরা ক্রেতাদের সেবায় নিয়োজিত" এগুলো অনেকটাই সনাতন প্রকৃতির ব্র্যান্ড ভ্যালু সৃষ্টি করে এবং এগুলো পার্থক্যমূলক নয়। বর্তমানে ক্রেতারা পার্থক্যমূলক ব্র্যান্ড ভ্যালুর প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড ভ্যালুগুলো দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী হতে পারে। বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদী ব্র্যান্ড ভ্যালুগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। প্রতিযোগী কোনো ব্র্যান্ড হঠাৎ করে স্বল্পমেয়াদী ব্র্যান্ড ভ্যালু সৃষ্টি করে অন্যান্য ব্র্যান্ডকে বিপাকে ফেলতে পারে। কোনো ব্র্যান্ড এক বা দুই সপ্তাহের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে যা অন্যান্য ব্র্যান্ডকে প্রভাবিত করবে। প্রতিষ্ঠানকে তার ব্র্যান্ড ভ্যালু সৃষ্টি করে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে সেটা গ্রাহকদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

চ. ব্র্যান্ড সারাংশ (Brand Essence): ব্র্যান্ড বিবরণ যদি অনেক বড় হয় তবে সেটাকে সঠিকভাবে ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করানো সবসময় সম্ভব হয় না। যে কারণে কয়েকটি শব্দ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্র্যান্ড বিবরণ তৈরি করা হয়। ব্র্যান্ডের এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনাকে ব্র্যান্ড সারাংশ বলা হয়। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনায় এটাকে ব্র্যান্ড মেনট্রা নামেও অভিহিত করা হয়েছে। এখানে কিছু বিশেষণ ব্যবহার করে ব্র্যান্ডের মূল বিষয়কে তুলে ধরা হয়। ব্র্যান্ড বিশ্লেষণ এবং পণ্য ক্রয়ের সময়ে এটা সহজেই ক্রেতার স্মরণে চলে আসে। নাইকির ব্র্যান্ড সারাংশ হল, "নাইকি অনুপ্রেরণামূলক"। ভলভো তাদের ব্র্যান্ড সারাংশ হিসেবে উপস্থাপন করছে "নিরাপত্তা"। ব্র্যান্ড সারাংশ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মনে আবেগময় যোগাযোগ স্থাপন করে। যেমন— ভলভো গাড়িতে ভ্রমণ করলে মনে হয় আমরা নিরাপদে আছি। ব্র্যান্ডের প্রমোশনের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড সারাংশ বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। একটা কথার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান করতে পারে। সৃষ্টিশীল ব্র্যান্ড সারাংশ ব্র্যান্ড সফলতার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ছ. ব্র্যান্ড পরিচয় (Brand Identity): ব্র্যান্ডের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে ব্র্যান্ড নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করবে তার উপর। ব্র্যান্ড নিজের পরিচয়ের মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপন করে থাকে। কেবলমাত্র নিজের লোগো দিয়েই নিজেকে উপস্থাপন করলেই ব্র্যান্ড পরিচিতি হয় না। এর পাশাপাশি আরো কিছু দৃশ্যমান উপাদানের সমন্বয়ে ব্র্যান্ড পরিচিতি লাভ করে। বিশেষত ব্র্যান্ডের কিছু দৃশ্যমান বিষয় যেমন— রং, ডিজাইন, প্রতীক, লোগো বিজ্ঞাপনের ভাষা ইত্যাদির সমন্বয়ে ব্র্যান্ড পরিচিতি তৈরি এবং ক্রেতাদের মনে অবস্থান গ্রহণ করানো হয়। অ্যাপেলের ভিজ্যুয়াল ইমেজ দেখে আমরা অ্যাপেল কোম্পানির পণ্যসমূহ সণাক্ত করতে পারি। ভিজ্যুয়াল বিষয়টি খুব সহজেই মানুষের মনের মধ্যে স্থান করে নেয়। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান শক্তি হলো ব্র্যান্ড পরিচিতি। প্রতিষ্ঠান তার ব্র্যান্ডকে কত সহজে এবং সুন্দরভাবে গ্রাহকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে তার উপর নির্ভর করবে ব্র্যান্ডের সফলতা এবং ব্যর্থতা। কারুকাজ সম্পন্ন একটি ব্র্যান্ড পরিচিতি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

জ. ব্র্যান্ড প্রতিজ্ঞা (Brand Promise): ব্র্যান্ড পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রধানত ব্র্যান্ডের দৃশ্যমান উপাদানসমূহের প্রতিফলন ঘটে। অন্যদিকে ব্র্যান্ড প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডের অদৃশ্যমান উপাদানসমূহের প্রতিফলন ঘটে। এখানে প্রধানত দেখা হয় ব্র্যান্ডের যারা ক্রেতা রয়েছে তারা প্রকৃত পক্ষে ব্র্যান্ডের কাছ থেকে কী আশা করে এবং এই ব্যাপারে প্রতিযোগী ব্র্যান্ডগুলোর অবস্থান কেমন। ব্র্যান্ড সম্পর্কে ক্রেতাদের কিছু অভিজ্ঞতা থাকে এবং এর প্রেক্ষিতে ব্র্যান্ডের নিকট ক্রেতাদের কিছু প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়। ক্রেতাদের এ সকল প্রত্যাশা পূরণে প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রমকে ব্র্যান্ড প্রতিজ্ঞা বলা হয়। ক্রেতারা একটি রেস্তোরাঁ থেকে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রত্যাশা করে। এখন যদি রেস্তোরাঁটি অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করে তবে সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো। ফলে ক্রেতা অসন্তুষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এখন ব্র্যান্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে প্রতিষ্ঠানটি কী এবং সে কাদের জন্য কী কী করতে চায়। একটি পরিবহন কোম্পানি যাত্রী সেবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্র্যান্ডিং করলো, কিন্তু বাস্তবে যাত্রী

সেবার কোন প্রতিফলন ঘটলো না, এ ক্ষেত্রে পরিবহন কোম্পানিটি বেশি দিন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে একটি ব্র্যান্ডটি তার সুনাম হারিয়ে ফেলবে ।

ঝ. ব্র্যান্ড বার্তা (Brand Message): উপরের ব্র্যান্ড উপাদানের যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো সবগুলোর সমন্বয়ে একটি বার্তা প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই বার্তাটি যথাযথভাবে গ্রাহকদের নিকট প্রেরণ করতে হবে। শক্তিশালী ব্র্যান্ড সৃষ্টি করে কোন লাভ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত বার্তাটি কাঙ্ক্ষিত গ্রাহকদের নিকট পৌঁছানো না যায়। এখানে ব্র্যান্ড পজিশনিং, ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য, ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি, ব্র্যান্ডের মৌলিক ভ্যালুসমূহ সুকৌশলে ক্রেতাদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে অনলাইনে বা টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্র্যান্ড বার্তা গ্রাহকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। ক্রেতারা ব্র্যান্ডের সুর, স্বর, ধ্বনি ইত্যাদি আগ্রহের সাথে অনুধাবন করে এবং সহজেই ব্র্যান্ড বার্তাকে প্রত্যক্ষণ করতে পারে। পণ্যের প্রকৃতি ও ক্রেতাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্র্যান্ড বার্তা তৈরি করা হয় এবং সেই বার্তা গ্রাহকদের নিকট পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ব্র্যান্ড বার্তা হলো একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ডিং হাতিয়ার। ব্র্যান্ডের তাৎপর্যকে অর্থবহ করতে এবং ভোক্তাদের আকৃষ্ট করার জন্য ব্র্যান্ড কর্তা কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

ঙ. ব্র্যান্ড ধারাবাহিকতা (Brand Consistency): ব্র্যান্ড বার্তা যথাযথভাবে গ্রাহকদের নিকট পৌঁছানোর পর এর সফল্য নির্ভর করে ব্র্যান্ড ধারাবাহিকতার উপর। সঠিকভাবে ব্র্যান্ডের ধারাবাহিকতা বজায় না রাখতে পারলে বাজারে ব্র্যান্ডটি তার ইমেজ এবং সুনাম ধরে রাখতে পারবে না। ব্র্যান্ড বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় গ্রাহকগণ সহজেই ব্র্যান্ডকে স্মরণ করতে পারছে, ব্র্যান্ড পরিচিতি হয়েছে যথার্থভাবে এবং ব্র্যান্ড যোগাযোগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ব্র্যান্ডের ধারাবাহিকতা না থাকার কারণে ব্র্যান্ডটি তার দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ব্র্যান্ড ধারাবাহিকতার মূল বিষয় হলো একটি ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠান যেভাবে উপস্থাপন করছে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সেটি অনুসরণ করতে হবে। যেমন— প্রতিষ্ঠান যেভাবে ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করছে ঠিক তার উল্টোভাবে পাইকারি বা খুচরা ব্যবসায়ীগণ প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করছে। আবার ডিলার বা এজেন্টগণ এটাকে অন্যভাবে বর্ণনা করছে। ব্র্যান্ড ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে সবাইকে একই ভাষায় কথা বলতে হবে। ব্র্যান্ড ধারবাহিকতার অভাবে ব্র্যান্ড তার বিশ্বাযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে থাকে। ব্র্যান্ড ধারাবাহিকতার বিষয়টি ব্র্যান্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

চ. কোম্পানির নীতি ও কৌশল (Policy and Strategy of the Company): কোম্পানি তার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য নানা ধরনের নীতি ও কৌশল গ্রহণ করে থাকে। কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের নীতি ও কৌশলগুলো ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবস্থাপনা পণ্য উৎপাদন এবং সফলভাবে পণ্য বিক্রয় করার জন্য একটি গতিশীল নীতি প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু দেখা গেলো পণ্য নীতিটি ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন— বলা যায়, "সকল পণ্য পরিবারে জন্য একটি ব্র্যান্ড নাম"— কোম্পানি এই কৌশল গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এই কৌশলটি বর্তমান বাজারের জন্য যুক্তি সংগত নয়। ফলে ব্র্যান্ডটি বাজারে অসফল হবে বলেই ধরে নেয়া যায়। এভাবে কোম্পানির নীতি ও কৌশল দ্বারা একটি ব্র্যান্ড নানাভাবে বাধাগ্রস্ত ও প্রভাবিত হতে পারে।

সারসংক্ষেপ:

একটি ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে বাজারে টিকিয়ে রাখা অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়। ব্র্যান্ড সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠার জন্য একজন ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপককে অনেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। বিশেষ করে যে বিষয়গুলো ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হতে হয়। ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহকে তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। প্রথমত, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হলো, কোম্পানির মিশন ও ভিশন, কোম্পানির নীতি ও কৌশল, কোম্পানির মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতি, কোম্পানির সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয়ত, বিপণন মিশ্রণ ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিপণন মিশ্রণের প্রভাব বিস্তরকারী উপাদানগুলো হলো, পণ্য, মূল্য, স্থান, প্রচার, মানুষ, বস্তুগত অবস্থা এবং প্রক্রিয়া। তৃতীয়ত, ব্র্যান্ড উপাদানসমূহ ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড উপাদানসমূহ হলো, গ্রাহক স্বচ্ছতা, ব্র্যান্ড পজিশনিং, ব্র্যান্ড ব্যক্তিত্ব, ব্র্যান্ড উদ্দেশ্য, ব্র্যান্ড ভ্যালু, ব্র্যান্ড সারাংশ, ব্র্যান্ড প্রতিজ্ঞা, ব্র্যান্ড বার্তা ও ব্র্যান্ড ধারাবাহিকতা। ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজ হলো ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করা এবং এদের প্রভাব থেকে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে মুক্ত করা।

পাঠ-১.৭ সবকিছু কী ব্র্যান্ড করা যায়
Can Anything Be Branded

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ডিংয়ের আওতা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ডিংয়ের পরিসীমা নির্ধারণ করতে পারবেন;
- সবকিছু কী ব্যান্ড করা যায় বুঝিয়ে বলতে পারবেন; এবং
- সবকিছু কী ব্যান্ড করা উচিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিপণনের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। বিপণনের প্রাথমিক অবস্থায় কেবলমাত্র বস্তুগত বা দৃশ্যমান পণ্যের সাথে ব্র্যান্ডিং জড়িত ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক বিষয় ব্র্যান্ডিংয়ের আওতাভূক্ত হয়েছে। সমাজে উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন বিষয়গুলোকে বিপণনকারীগণ সুকৌশলে ব্র্যান্ডিংয়ের আন্তর্ভূক্ত করেছে। কৃষকের উৎপাদিত ধান, চাল, আটা, গম ইত্যাদি পণ্যরে ক্রয়-বিক্রয় চলছিল খোলা বাজারে। কিন্তু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো এ সকল পণ্যের বাজারে প্রবেশ করে সনাতন ব্যবসার ধরন পাল্টে দিয়েছে। এখন চাল, ডাল, আটা, ছাতু ইত্যাদি সনাতন পণ্যসমূহ নিয়ে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে। এখন দেশের নিম্ন আয় থেকে শুরু করে উচ্চ আয়ের মানুষেও তাদের যে কোনো ধরনের কেনাকাটায় ব্র্যান্ডেড পণ্যসমূহকে তাদের পছন্দের তালিকায় রাখছে। এভাবে দিনে দিনে ব্র্যান্ডিংয়ের আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাজারে সকল পণ্যের সমান গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। ব্র্যান্ডের সার্বজনীনতা পণ্যের বৈশিষ্ট্য ও বাজার চাহিদার উপর নির্ভর করে। যে পণ্যসমূহ ভোক্তাদের পছন্দের সাথে সরাসরি জড়িত এবং ভোক্তাদের ইতিবাচক প্রত্যক্ষণ দ্বারা মূল্যায়িত হয় তাদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্র্যান্ডিং প্রয়োজন। তবে ঢালাওভাবে যে কোনো পণ্য বা সেবার জন্য ব্র্যান্ডিং এর প্রয়োজন নেই।

সবকিছুকে কী ব্র্যান্ড করা যায়

Can anything be Branded

মূলতঃ ব্র্যান্ডিং হলো এক ধরনের বিপণন কার্যক্রম যার অধিন পণ্য বা সেবা প্রদানকারী কোম্পানির স্বতন্ত্র নাম, প্রতীক, লোগো ইত্যাদি ট্যাগ করে তার সঠিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে ব্র্যান্ডিং অনেক ব্যয় বহুল তাই এটা কেবল বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। অনেকে বলে থাকে পাবলিক ও সোশ্যাল প্রতিষ্ঠানের জন্য আসলে ব্র্যান্ডিংয়ের প্রয়োজন আছে কী? সেই থেকে প্রশ্ন আসে যে সবকিছুকে কী ব্র্যান্ড করা যায়? আসলে মানুষ যে কোনো বিষয় জানার পূর্বে তার পরিচিতি জানতে চায়। তাই কেবল পণ্য, সেবা বা ব্যবসায়ের সাথেই ব্র্যান্ড জড়িত নয় বরং যে কোনো বিষয়ের ব্র্যান্ডিং হতে পারে। প্রতিষ্ঠান কী পণ্য তৈরি করছে সেটার চাইতে বড় বিষয় হলো প্রতিষ্ঠান কীভাবে পণ্যটি উপস্থাপন করছে। বর্তমানে যে কোনো পণ্য বা সবা গ্রহণ করার পূর্বে তার ক্রেতাগণ সেই বিষয়গুলোর যথাযথ পরিচিতি জানতে চায়। ফলে সবকিছুকেই ব্র্যান্ডিং করা যায়।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে বিপণনের বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন হচ্ছে। বিপণনের প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল মাত্র বস্তুগত ও দৃশ্যমান বিষয়ের সাথে পণ্য জড়িত ছিল এবং কেবলমাত্র এগুলোই ব্র্যান্ডিংয়ের আওতাভূক্ত ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছু এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন— দৃশ্যমান বস্তু, সেবা, ব্যক্তি, স্থান, সম্পত্তি, সংগঠন, অভিজ্ঞতা, তথ্য ও ধারণা ইত্যাদি। তবে ব্র্যান্ডের সার্বজনীনতা চিহ্নিত করার জন্য আমরা কিছু পৃথক পণ্যকে বিবেচনা করতে পারি। পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের বিপণন পরিসর নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. বস্তুগত পণ্য (Physical Goods): বস্তুগত পণ্য বলতে এমন কিছু দৃশ্যমান বস্তু বুঝায় যা ভোক্তার প্রয়োজন ও অভাবের সন্তুটি বিধান করতে পারে। বস্তুগত পণ্য বলতে দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বোঝানো হয়। যেমন— খাতা, কলম, চেয়ার, টেবিল

ইত্যাদি। ব্র্যান্ডিং সরাসরি সকল ধরনের বস্তুগত পণ্যের সাথে জড়িত থাকে। অনেক জনপ্রিয় পণ্যের পরিচিতি হিসাবে নানাধরনের ভোগ্যপণ্য বা শিল্প পণ্য রয়েছে। এখানে রোলেক্স ঘড়ি বা নেসক্যাফের কথা বলা যায়। এই পণ্যসমূহের বাজার বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন বিস্কুট, চানাচুর বা কেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসাধনী পণ্যের ক্রেতারা কোনো সময় তাদের পছন্দের ব্র্যান্ডের বাইরে যেতে চায় না। শিল্প পণ্যের ক্ষেত্রেও ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুগত পণ্য নিয়ে প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক. বি২বি পণ্য (B2B Product): বিজনেস টু বিজনেসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ হলো বি২বি। এটি এমন এক ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেন যেখানে দুইটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পণ্য কেনা বেচা হয়। বাটার জুতার উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, জুতা কীভাবে বাটা শো-রুমে আসে এবং আমাদের নিকট পৌঁছায়। প্রথমে উৎপাদক বিভিন্ন সরবরাহকারীদের নিকট থেকে চামড়া সংগ্রহ করবে, তারপরে চামড়া প্রক্রিয়াজাত, জুতা প্রস্তুত, প্যাকেটজাত, গুদামজাত এবং শেষে শো-রুমগুলোতে বিতরণ করা হয়। বি২বি শুরু হয় কাঁচামাল ক্রয় থেকে এবং শেষ হয় পণ্য বিক্রয়ের আগে পর্যন্ত।

প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান তাদের ভাবমূর্তি অনুকূলে রাখার জন্য পণ্যের ব্র্যান্ডিং করে থাকে। শক্তিশালী ব্র্যান্ড উৎপাদক ও সরবরাহকারীর মাঝে একটি সুন্দর আস্থার সম্পর্ক তৈরি করে। বি২বি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর্পোরেট ব্র্যান্ড। কর্পোরেট ব্র্যান্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংকে বিশ্লেষণ করা খুবই জটিল বিষয়। একটি প্রতিষ্ঠান যখন ব্যবসায়িক উদ্যোগে তার স্টেকহোল্ডারদের কাছে নিজ প্রতিষ্ঠানকে উপস্থাপন করে তাকে কর্পোরেট পরিচয় বলা হয়। এখানে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার চেয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রচার এবং প্রচারণার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ অ্যাপেল ব্র্যান্ডের কথা বলা যায়। এই ব্র্যান্ডটি সারা পৃথিবীতে তাদের ইমেজ ও সুনাম ছড়াতে সক্ষম হয়েছে। বি২বি পণ্য ব্র্যান্ডিং এর সাথে বিভিন্ন শ্রেণির সরবরাহকারীদের সমন্বয় করতে হয় বিধায় এটি অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি করে। তবে বি২বি পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ভ্যালু সরবরাহ কৌশল, অভীষ্ট বাজার ও ক্রেতা, স্টেকহোল্ডার বিবেচনা, ব্র্যান্ডিং অ্যাপ্রোচ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে।

খ. বি২সি বিপণন (B2C Products): ব্যবসা থেকে গ্রাহক যা সংক্ষেপিত হয়ে বি২সি হয়েছে, যেখানে ব্যবসায় চূড়ান্ত গ্রাহকের কাছে তার পণ্য ও সেবাসমূহ বিক্রয় করে। বিপণনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে বি২সি-এর কার্যক্রমের উপর। এখানে মধ্যস্থকারীগণ বিভিন্নভাবে পণ্য ব্র্যান্ডিং করে। বিক্রয় প্রক্রিয়ার আচরণের জন্য বি২সি পণ্যের ব্র্যান্ড ইক্যুইটি সৃষ্টিতে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ ভোগ্য পণ্যের গৃহীত কর্মসূচিসমূহ থেকে ভিন্ন হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিভিন্ন খুচরা কারবারিগণ নানা ভাবে পণ্য ব্র্যান্ডিং করে। বি২সি পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডিং চর্চার প্রয়োজন হয়। বি২সি পণ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি খুচরা কারবারিগণ ও ক্রেতা সাধারণ জড়িত থাকে। ফলে এখানে খুচরা কারবারিগণ পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পণ্য বিক্রয়ের জন্য খুচরা কারবারিগণ বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে।

বি২সি ব্র্যান্ড বিভিন্নভাবে বিক্রয় বৃদ্ধি করে থাকে। এখানে সরাসরি ক্রেতাদের সামনে পণ্য উপস্থাপন করা হয় এবং নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে যারা অন্য কোম্পানির পণ্য ব্যবহার করতো তাদের নিকট উপস্থাপিত ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হয়। বি২সি পণ্যের ক্ষেত্রে বাজার বিভক্তিকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একই ব্র্যান্ডের পণ্য শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার ইত্যাদির মধ্যে একই রকম আবেদন সৃষ্টি করে না। তাই অনেক সময় খুচরা স্টোরসমূহ বি২সি পণ্যসমূহ রিব্র্যান্ডিং করে থাকে।

গ. হাইটেক পণ্য (High-Tech-Products): বস্তুগত পণ্যের একটি বিশেষ শ্রেণি হচ্ছে হাইটেক পণ্য। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছর নতুন নতুন পণ্য ও সেবা বাজারে প্রবেশ করছে। আজকে যে পণ্যটি দাপোটের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, আগামিতে সে পণ্যটি বাজারে থেকে হারিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোডাক বা ফুজি কালারের কথা বলা যায়। আমারা স্মার্ট ফোনোর মত প্রযুক্তি নিবিড় পণ্য কীভাবে ক্যামেরা, ঘড়ি, রেডিও, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি ব্যবসায়ের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা প্রত্যক্ষ করছি। কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের কথা বলা যায় যারা হাইটেক পণ্য উৎপাদন করে। যেমন— ঔষধ শিল্প, কম্পিউটার ডিভাইস, ম্যানুফ্যাকচারিং, স্বয়ংক্রিয় ম্যানুফ্যাকচারিং, ইলেকট্রনিক ও টেলি-কমিউনিকেশন ইত্যাদি। বর্তমানে হাইটেক পণ্য কেবল কম্পিউটার, স্মার্টফোন, প্রিন্টেড অর্গান, হোভার বোর্ড বা স্বয়ক্রিয়ভাবে চালিত গাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং অনেক প্রচলিত পণ্য, যেমন— জিলেটের বিভিন্ন ধরনের রেজার, নাইকির নানা ধরনের জুতো বা লিগোর

বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রী হাইটেক পণ্যের অন্তর্ভূক্ত। হাইটেক পণ্যের ব্র্যান্ডিং নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করে থাকে। তাদের মতে হাইটেক পণ্যের জন্য ব্র্যান্ডিং খুব প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। তবে হাইটেক পণ্যের সফল বিপণনে ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিখ্যাত হাইটেক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্যসমূহ যথাযথ ব্র্যান্ডিং করছে। উদাহরণস্বরূপ আমাজন, অ্যাপেল, গুগুল বা ফেসবুকের কথা বলা যায়। গবেষণা ও উন্নয়ন-এর ক্রমশ অগ্রগতি ও উদ্ভাবনের কারণে হাইটেক কোম্পানিগুলোকে সবসময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানকে নতুন প্রযুক্তি ও নতুন ব্র্যান্ডিংকে মোকাবেলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

২. সেবা (Service): বস্তুগত পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ের মত সেবাসমূহের ব্র্যান্ডিং অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেবা হচ্ছে অদৃশ্যমান, অস্পর্শনীয় কিছু কার্যক্রম যা মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সন্তুষ্টি প্রদান করে। তাই বস্তুগত পণ্যের মধ্যেই ব্র্যান্ডিংয়ের আওতা সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের সেবা ব্র্যান্ডিংয়ের আওতাভূক্ত । ভোক্তারা বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্যক্রম ব্যবহারের পূর্বে বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে অনুসরণ করছে। যেমন— কোনো ডাক্তারের সিরিয়াল পেতে এক মাস সময় লাগছে আবার কোনো ডাক্তারের সেবা পেতে সিরিয়াল লাগছে না। শক্তিশালী সেবা ব্র্যান্ডসমূহ যেমন— বৃটিশ এয়ারওয়েজ, অ্যাপোলো হসপিটাল, সুইস ব্যাংক, ফেডারেল এক্সপ্রেস, এলিকো লাইফ ইন্সুরেন্স এগুলো বহু বছর ধরে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

সেবা একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং এর কিছু ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেবা ক্রয়ের পূর্বে পরীক্ষা করে দেখা বা স্বাদ নেয়া যায় না। আবার কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার সেবার মানে পার্থক্য রয়েছে। একজন শিল্পীর পক্ষেও প্রতিটি অনুষ্ঠানে সমান পারফরম করা সম্ভব নয়। ফলে সেবার ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এ সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। তাই শক্তিশালী ব্র্যান্ডসমূহ বস্তুগত সাজসজ্জা ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের জন্য ক্রেতাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক স্থাপন করছে। সেবার ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হলো সেবার গুণগত মান। যদিও সেবা মানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন ব্যাপার। তথাপি সেবা কোম্পানিগুলো তাদের গুণগতমানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। বর্তমানে বড়, মাঝারি এমনকি ছোট সেবা কোম্পানিগুলোও ব্র্যান্ডিংয়ের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে।

৩. অভিজ্ঞতা (Experiences): কোনো বিষয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান হচ্ছে অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন পণ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন করে। অভিজ্ঞতা হচ্ছে কোনো একটি কাজের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন। হজ্ব পালন করতে গিয়ে মানুষ হজ্বের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। ক্রিকেট ক্যাম্পে এক মাস কাটিয়ে ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাকে ব্র্যান্ডিং করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অ্যাপেল লিজেনডারী কিনোটের কথা বলা যেতে পারে। এখানে পণ্য ক্রয়ের পূর্বে ক্রেতাদের পণ্য ব্যবহারে সুযোগ দেওয়া হয় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এবং ক্রেতাদের ভ্যালু ওপটিমাইজেশন বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন বিষয়সমূহ ফেসবুক ও ইনস্ট্রাগ্রামে আপলোড কওে, যাতে ক্রেতারা এই ব্র্যান্ডের ভক্ত হয়ে যায়। এখানে প্রথমেই দেখতে হয় ক্রেতাগণ পণ্য বা সেবা থেকে কী ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। টিম কুক নিচে নেমে এসে দর্শকদের সাথে ছবি তুলছে। এগুলো মনে রাখার মত অভিজ্ঞতা যা মানুষ অন্যদের সাথে শেয়ার করে। এ সকল অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে। অভিজ্ঞতা ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে শেয়ারিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা এমন কিছু যা মানুষ একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে এবং মনে রাখে যে প্রতিষ্ঠানের কারণে তাদের কী দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

৪. ইভেন্টস (Events): নির্দিষ্ট ক্রেতাদের নিকট সংবাদ পৌঁছানোর জন্য বিশেষ ঘটনা সম্বলিত ডিজাইন প্রণয়নকেই ইভেন্টস বলে। সাধারণত বিপণনকারীরা সময়ভিত্তিক ইভেন্টস প্রবর্তন করে। যেমন— বিশ্বকাপ ফুটবল, অলিম্পিক, প্রতিষ্ঠানের বর্ষপূর্তি, ট্রেড শো, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি। বিপণনকারীগণ এ সকল ইভেন্টসকে ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় নিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় নিয়ে এসেছে। বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাব বা রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব তারা নিজেরাই এখন প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড। স্পন্সরশিপ, প্রত্যক্ষ বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে অনেক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্র্যান্ডকে বিপণন করছে। ব্র্যান্ডিংয়ের এ ধরনের কৌশল প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে এবং বাজারে তাদের ইমেজকে বৃদ্ধি করেছে। বিভিন্ন ইভেন্টস থেকে জনগণ অনেক কিছু আশা করছে। যার ফলে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডসমূহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবা অফার করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডসমূহ বিশ্বকাপ ফুটবল, অলিম্পিক বা বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নানা ধরনের পণ্য ও সেবা ক্রেতাদের জন্য বাজারে নিয়ে আসছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অলিম্পিক ডাইরি, ক্যাপ, কোর্ট পিন, টি-শার্ট ইত্যাদি অত্যন্ত লোভনীয় বিষয়

এবং এগুলো বাজার থেকে উচ্চমূল্যে ক্রেতারা সংগ্রহ করছে। যে সিনেমা প্রডিউসর নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে তারাই সফলতা লাভ করছে। হ্যারিপটার বা ব্যাটম্যান এখনো জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে।

৫. ব্যক্তি (Person): অভিষ্ট বাজারে কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠির ইমেজ, দক্ষতা, গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। একজন মানুষের প্রতি একটি লক্ষ্য বাজারে অনুকূল অবস্থা তৈরি করা হয়। বর্তমানে খ্যাতি বিপণনকে একটি বড় ধরনের ব্যবসায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। খ্যাতি বিপণনের জন্য প্রথমে ব্যক্তি ব্র্যান্ডিং প্রয়োজন। ব্যক্তিকে যথাযথভাবে ব্র্যান্ডিং না করতে পারলে তার বাজার চাহিদা সৃষ্টি হবে না। এক সময় খ্যাতি প্রচারের জন্য সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হতো। বর্তমানে ফেসবুক, টিকটক, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খ্যাতির প্রচারণা করা হচ্ছে। একজন চিকিৎসক নিজেকে ব্র্যান্ডিং করা ছাড়া পেশাগত সফলতা লাভ করতে পারছে না। সমাজে যারা সেলিব্রেটি রয়েছে, আইনজীবী অথবা অন্যান্য পেশাজীবীরা খ্যাতি বিপণনের সাহায্য নিচ্ছে। অনেক ব্যক্তি ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাহিত্য বিষয়ে নিজেদের দর্শন তুলে ধরছে। বর্তমানে ব্যক্তি বিপণনে নিজের ঢোল নিজেকে পেটাতে হচ্ছে। ফলে খ্যাতি বিপণনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে বিভিন্নভাবে ব্র্যান্ডিং করছে।

৬. স্থান (Place): স্থান ব্র্যান্ডিং বলতে কোন একটি বিশেষ স্থানকে সম্ভাব্য গ্রাহকদের নিকট আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিপণন কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বিপণন ব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করছে। দেশ-বিদেশের দর্শনীয় এলাকাসমূহকে সঠিকভাবে ব্র্যান্ডিং করে এদের দর্শনার্থীদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। বিপণনের বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্য বা সেবা ভৌগোলিক অবস্থানের অনুকূলে ইমেজ সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশের অনেক পণ্য জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন (জি-আই) বা ভৌগোলিক নির্দেশক হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। যেমন—উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম, রাজশাহীর সিল্ক, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাল, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, রংপুরের শতরঞ্জি, নেত্রকোণার সাদামাটি ইত্যাদি। ফলে স্থান ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর অনেক দেশের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ পর্যটন শিল্প থেকে আসে। কিছুদিন আগেও ভ্রমণ নিয়ে মানুষের মধ্যে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ১৫/১৬ বছরের ছেলে-মেয়েরাও বিশ্ব ভ্রমণে বের হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানকে এমন ভাবে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে যে মানুষ সহজেই সেই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

৭. সম্পত্তি (Properties): সম্পত্তি হলো প্রকৃত সম্পদ যেমন— রিয়েল এস্টেট অথবা আর্থিক সম্পত্তির মালিকানা (স্টক, শেয়ার বা বন্ড ইত্যাদি)। সম্পত্তি বলতে প্রকৃত সম্পদ বা আর্থিক সম্পদের অস্পর্শনীয় অধিকারকে বুঝায়। এখন সকল ধরনের সম্পত্তি বিপণনের আওতাভূক্ত এবং এদের ব্যাপকভাবে ব্র্যান্ডিং করা হয়। বড় বা ছোট রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর ব্র্যান্ডিং এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রিয়েল এস্টেট ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অভিষ্ট ক্রেতাদের সাথে একটা আবেগের সম্পর্ক তৈরি করা হয়। নিজ এলাকায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে ক্রেতাদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছে এবং প্রতিযোগিতায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখছে। এখানে কোম্পানি কিছু বিশ্বস্ত ক্রেতা সৃষ্টি করে এবং ক্রেতাগণ অন্যদের পণ্য ক্রয়ে উৎসাহ ও পরামর্শ দিচ্ছে। বর্তমানে রিয়েল স্টেট কোম্পানিসমূহ তাদের পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য অনলাইন বিপণন ব্যবস্থাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। জমি, ঘর-বাড়ি, দালানকোঠা, গাড়ি, শেয়ার, বণ্ড, সুনাম ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। এ সকল সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা হয় এবং এগুলো বিপণন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এ সকল বিষয়গুলো প্রতিনিয়ত নানাভাবে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সুনামকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে। শেয়ার বাজারে যে সকল কোম্পানির ব্র্যান্ড ইমেজ ভালো তারা সহজেই ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে পারছে।

৮. সংগঠন (Organization): বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠনসমূহ নানা ধরনের বিপণন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সংগঠনের প্রতি ক্রেতাদের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করছে। অন্যভাবে বলা যায়, অভিষ্ট ক্রেতাদের মনে জোরালো ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্য সংগঠনগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সংগঠনগুলো নিজেদের ব্র্যান্ডিং করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। গুগুল বা গ্রামীণফোনের মত প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের ব্র্যান্ডিং করার জন্য ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করেছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে ক্রেতারা সংগঠনের প্রতি লক্ষ্য রেখে পণ্য বা সেবা গ্রহণ করে। ফলে সংগঠনগুলোকে

ক্রেতামুখি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হচ্ছে। নিজ প্রতিষ্ঠানকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে। তাই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধির জন্য সংগঠনকে বিভিন্ন ভাবে ব্র্যান্ডিং করছে। দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ সচেতন সংগঠনগুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বা ধর্মীয় সংগঠনগুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের বিভিন্ন ভাবে ব্র্যান্ডিং করছে।

৯. তথ্য (Information): বর্তমান বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তথ্য। যে প্রতিষ্ঠান যত বেশি তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে পারে তার বিপণন সফলতা তত বেশি বৃদ্ধি পায়। পণ্য বা সেবার মত তথ্যকেও উৎপাদন ও বিপণন করা যায়। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য উৎপাদন করে এবং মূল্যের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও সমাজের নিকট বিক্রি করে। কম্পিউটার সংক্রান্ত ম্যাগাজিনগুলো কম্পিউটার সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করে থাকে। তথ্য বিপণনে কোনো পণ্য বা সেবার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয় এবং এটা ক্রেতাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করে। পণ্য বা সেবা সংগ্রহ থেকে শুরু করে এর ব্যবহার বিধির বিস্তারিত বিবরণ এখানে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ই-বুক, ভিডিও, ব্লগ বা ম্যানুয়ালসমূহ তথ্য বিপণনের আওতাভূক্ত কারণ এখানে সেই প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। বিশ্বকোষ এবং ননফিকশন বইগুলো তথ্য বিপণন করে থাকে। যে সকল প্রতিষ্ঠান তথ্য বিপণনের সাথে জড়িত তারা নানাভাবে নিজেদের ব্র্যান্ডিং করছে। বিভিন্ন ধরনের মেডিক্যাল ম্যানুয়ালসমূহ ক্রেতাদের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অক্সফোর্ড চিকিৎসা ম্যানুয়ালের গ্রহণযোগ্যতা ক্রেতাদের কাছে অনেক বেশি। আবার অমূলক তথ্য প্রকাশের জন্য অনেক পত্র-পত্রিকা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যার্থ হয়। বর্তমানে তথ্য উৎপাদন, বন্টন, প্যাকেজিং ও তথ্য ডিজাইনকে সমগ্র পৃথিবীতে বৃহৎ শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া সিডি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রেতারা তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ফলে আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় তথ্য ব্র্যান্ডিংকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

১০. ধারণা (Ideas): বাজারে অফারকৃত প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে ধারণা নিহিত থাকে। ধারণা বা সুবিধা সরবরাহের মাধ্যম হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবাকে বিবেচনা করা হয়। সনাতন বিপণন পদ্ধতিতে সামাজিক বিপণনকারীরা ধারণা বিপণন করার কাজে নিয়োজিত থাকতে। তাদের বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান ছিল যেমন— “গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান” বা “নিয়মিত ব্যায়াম করুন, স্বাস্থ্যকে সুন্দর রাখুন” ইত্যাদি। বর্তমানে প্রায় সকল সফল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের ধারণা বিপণন ও ব্র্যান্ডিং করছে। কেবল মাত্র সামাজিক বিষয় নিয়ে ধারণা বিপণন করা হচ্ছে না বরং প্রতিষ্ঠান তার পণ্য ও সেবা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ধারণা ব্র্যান্ডিং করছে। যেমন— ভলভোর কথা উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভলভোর শ্লোগান হলো আমরা গাড়ি বিক্রয় করি না, আমরা নিরাপদ ভ্রমণ বিক্রয় করি। একটি সৃষ্টিশীল ধারণা কোনো প্রতিষ্ঠানকে রাতারাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। প্রতিষ্ঠান সবসময় ধারণা ব্র্যান্ডিং করছে যা ক্রেতাদের তথা সকলের ভবিষ্যতকে সুন্দর করে। একটা ধারণাকে উদ্ভাবন এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা হয় যা থেকে ক্রেতারা তাদের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। একটা গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের গাড়ি সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে যে, “এটা কেবল গাড়ি নয়, বরং এটা আপনার সম্পদ, নিরাপত্তা ও অহংকার।” ফলে এসকল ধারণাসমূহকে ব্র্যান্ডিং করে প্রতিষ্ঠানসমূহ চূড়ান্ত ভাবে সফলতা লাভ করছে।

উপসংহারে এটা বলা যায় যে, সবকিছুকেই ব্র্যান্ডিং করা যায়। বিপণনের আওতাভূক্ত সকল বিষয়ের ব্র্যান্ডিং করা সম্ভব। পণ্য, সেবা, স্থান, ব্যক্তি, সংগঠন, তথ্য, অভিজ্ঞতা, ইভেন্টস্, সম্পত্তি, ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি, বেসরকারি ও অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের ব্র্যান্ডিং করছে। সমুদ্রের মধ্যে রেস্টুরেন্ট তৈরি করে সেটাকে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। সেভাবে আকাশ, বাতাস বা সূর্যকে কেন্দ্র করেও ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। তবে যে সকল পণ্যের কোন বাস্তব উপযোগিতা নেই তাদের ব্র্যান্ডিং না করায় যুক্তিযুক্ত।

সবকিছুকে কী ব্র্যান্ডিং করা উচিত?

Should Everything Be Branded?

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি ব্র্যান্ডিংয়ের আওতা অনেক বিস্তৃত। সেখানে আমরা দেখেছি সব কিছুকেই ব্র্যান্ড করা যেতে পারে। অনেকে ব্র্যান্ডেড পণ্য ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে থাকে, কারণ এগুলো টেকসই এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য। নন-ব্র্যান্ডের পণ্য কিনে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং ব্যবহারে পূর্ণ তৃপ্তিও পাওয়া যায় না। আবার এর বিপক্ষে অনেকে বলে থাকে যে ব্র্যান্ডেড পণ্য অনেক ব্যয়বহুল হয়ে থাকে এবং অযথা এদের পিছনে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়।

ব্র্যান্ডের পণ্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তি দাঁড় করানো যায়। তবে এটা নিয়ে একটা মৌলিক প্রশ্ন ওঠে সেটা হলো সব কিছুকে কী ব্র্যান্ড করা উচিত? কোনো একটা বিষয়কে ব্র্যান্ডের আওতায় নিয়ে আসার আগে তার ব্র্যান্ডিং করার উপযুক্ততা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। ব্র্যান্ডের প্রাথমিক কাজ হলো পণ্যের পরিচিতি। এখন প্রশ্ন হলো সকল পণ্যের কী আসলেই পরিচিতি দরকার? এখন একটা প্রতিষ্ঠান একটা নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে। এখানে পণ্যটি কেবল দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্র্যান্ডিংয়ের কী প্রয়োজন রয়েছে? আবার দেখা যায় একজন ফল বিক্রেতার কাছে অনেক ধরনের বিদেশি ফলের সমাহার রয়েছে। এখানে যদি কোনো ক্রেতার বিশেষ কোন দেশের প্রতি নেতিবাচক ধারণা থেকে থাকে তবে সেখানে ব্যান্ডের বিষয়টি না থাকাই ভালো হবে। ব্র্যান্ডিংয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো প্রতিযোগী পণ্যের সাথে পার্থক্য সৃষ্টি করা। এখন কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা করে অথবা বাজারে যদি তাকে কোনো প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে না হয় তবে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্র্যান্ডিংয়ের মত একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ায় যাওয়াটা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে। ব্র্যান্ড সৃষ্টির পর যদি সেটাকে ঠিক মত প্রমোট না করা হয় বা ব্যবস্থাপনা জনিত ত্রুটি থাকে তবে সেটি বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। মোট কথা ব্র্যান্ডের মধ্যে অনেক উপাদান থাকে আর সেগুলো যদি ব্র্যান্ড দ্বারা প্রতিফলিত না হয় তবে সে ব্র্যান্ডগুলো তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। যেমন— একটি ব্র্যান্ডের মৌলিক কাজ হলো ভ্যালু সৃষ্টি করা। এখন অনেক বিনিয়োগ করে ব্র্যান্ড সৃষ্টি করা হলো কিন্তু এই ব্র্যান্ড থেকে যদি কোনো ভ্যালু সৃষ্টি না হয় তবে এটা ক্রেতাদের মনে স্থান করতে ব্যর্থ হবে। এ বিষয়ে অনেকে মতামত প্রদান করেছেন যে, যে সকল বিষয়ের বাস্তব কোনো উপযোগিতা নেই তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় আনা উচিত নয়। যে সকল পণ্য বা সেবা মানুষের কোনো উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে না তাদের আসলে ব্র্যান্ডিংয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি রক্ষণশীল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বিফ-বার্গার ব্র্যান্ডিং করে কোনো রেস্তোরাঁ হাজার চেষ্টা করে সফলতা লাভ করতে পারবে না। একটা বিচ্ছিন্ন স্থান যেখানে কোনো নাগরিক সুযোগ সুবিধা নেই, তাকে পর্যটনের আওতায় নিয়ে ব্র্যান্ডিং করাটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়া হবে। অনেক সমাজ বিরোধী পণ্য রয়েছে যাদের সমাজে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তথাপি তাদের ব্র্যান্ডিং আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

সারসংক্ষেপঃ

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিপণনের নানাবিধ বিষয়ের সর্বদাই পরিবর্তন হচ্ছে। সে কারণে বিপণনের আওতা ও পরিধি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপণনের আওতাভূক্ত সকল বিষয়কে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। বিপণনের প্রাথমিক অবস্থায় কেবল শিল্প পণ্যসমূহ ব্র্যান্ডিংয়ের আওতাভূক্ত ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক বিষয় ব্র্যান্ডিংয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। বস্তুগত পণ্য যেমন— টেবিল, চেয়ার, টেলিভিশন, ঘড়ি; সেবা পণ্য যেমন— ব্যাংক, বীমা, পরিবহন; অভিজ্ঞতা যেমন— অভিজ্ঞ ক্রিকেটার; ইভেন্টস যেমন— বিশ্বকাপ ফুটবল, ক্রিকেট বা অলিম্পিক; ব্যক্তি যেমন— রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব; স্থান যেমন— কুয়াকাটা, তাজমহল, বা আইফেল টাওয়ার; সম্পত্তি যেমন— রিয়েল এস্টেট, স্টক, শেয়ার বা বণ্ড; সংগঠন যেমন— গুগুল, গ্রামীণফোন বা রোভার স্কাউটস; তথ্য যেমন ই-বুক, ভিডিও, ব্লগ; ধারণা যেমন— গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান ইত্যাদি বিষয়সমূহ ব্র্যান্ডিংয়ের আওতাভূক্ত হয়েছে। সকল উপযোগ সৃষ্টিকারী বিষয়কে ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় আনা সম্ভব তবে যে সকল পণ্যের উপযোগিতা নেই তাদের ব্র্যান্ডিং করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিপণন ব্যবস্থায় ব্র্যান্ডিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে পণ্যসমূহ ভোক্তাদের পছন্দের সাথে সরাসরি জড়িত এবং ভোক্তাদের ইতিবাচক প্রত্যক্ষণ দ্বারা মূল্যায়িত হয় তাদের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং প্রয়োজন। তবে ঢালাও ভাবে যে কোনো পণ্য বা সেবার জন্য ব্র্যান্ডিংয়ের প্রয়োজন নেই।

পাঠ-১.৮ ব্র্যান্ড লয়্যালটি
Brand Loyalty

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ড লয়্যালটি কী তা বলতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড লয়্যালটি ও গ্রাহক লয়্যালটির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- ব্র্যান্ড লয়্যালটির প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ব্র্যান্ড লয়্যালটির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

একটি পণ্য ক্রয়ের পর ক্রেতা পণ্যটি ব্যবহার বা ভোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পেতে চায়। এরূপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভোক্তার প্রত্যাশা এবং পণ্যের প্রকৃত দক্ষতা পারস্পরিকভাবে যুক্ত। তাই নির্দিষ্ট কোনো পণ্য ক্রয়ের পর ক্রেতা পণ্যটি ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হতে পারে অথবা অসন্তুষ্ট হতে পারে। ক্রেতা সন্তুষ্ট হলে সে বারবার পণ্যটি ক্রয় করবে এবং তার পরিচিত মহলে পণ্যটি ক্রয়ের জন্য সুপারিশ করবে। এ ধরনের বিষয়টি যখন কোনো ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তখন তাকে ব্র্যান্ড লয়্যালটি বলা হয়। ব্র্যান্ডটি পুনঃক্রয়ে অথবা ব্র্যান্ড সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ভোক্তার সন্তুষ্টি পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। একটা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সফলতা নির্ভর করে ব্র্যান্ড লয়্যালটির উপর। প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড লয়্যালটি যত বেশি বৃদ্ধি পাবে প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড ইমেজ তত বেশি শক্তিশালী হবে। ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি, বিপণন খরচ কমানো, ক্রেতা সৃষ্টি, ক্রেতা ধরে রাখা ইত্যাদি সুবিধাসমূহ অর্জিত হয়। পণ্যের প্রকৃত গুণাবলী বিশ্বস্ততার সাথে তুলে ধরার বিষয়ে বিপণনকারীকে মনোযোগী হতে হয়। ক্রেতাদের প্রত্যাশার চাইতে যদি প্রাপ্তি বেশি হয় এবং এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তবে ব্র্যান্ড লয়্যালটির সৃষ্টি হয়।

ব্র্যান্ড লয়্যালটি
Brand Loyalty

ব্র্যান্ড লয়্যালটি হল যখন গ্রাহকরা একই ব্র্যান্ড থেকে বারবার ক্রয় করতে থাকে। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো যে, যখন বাজারে প্রতিযোগীরা তাদের ব্র্যান্ডের জন্য ঠিক একই ধরনের সেবা ও সুবিধাসমূহ প্রদান করে অথবা বেশি কিছু প্রদান করে তথাপি লয়্যাল ক্রেতারা ব্র্যান্ড ইমেজের কারনে তাদের পছন্দের ব্র্যান্ডটি ক্রয় করে। যেমন— যে সকল ক্রেতারা কোকাকোলা পছন্দ করে তারা কেবল কোকাকোলা ক্রয় করেবে। আবার যারা পেপসি পছন্দ করে তারা পেপসি ক্রয় করেবে। ক্রেতাদের এই ক্রয় আচরণের কারণ হলো ব্র্যান্ড আনুগত্য বা ব্র্যান্ড লয়্যালটি। American Marketing Association এর মতে, "The Situation in which a consumer generally buys the same manufacturer-oriented product or service repeatedly over time rather than buying from multiple suppliers within the category." অর্থাৎ, যে পরিস্থিতিতে ভোক্তারা সাধারণত দীর্ঘ সময় ধরে একাধিক সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কেনার পরিবর্তে উৎপাদনভিত্তিক একই পণ্য নিয়মিত ক্রয় করে। ব্র্যান্ড লয়্যালটি মূলতঃ নির্ভর করে ক্রেতা সন্তুষ্টির উপর। ক্রেতার প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি যদি সমান হয় তবে সেই স্তরকে ক্রেতার সন্তুষ্টি বলে। ক্রেতার প্রাপ্তি যদি প্রত্যাশার চেয়ে কম হয় তবে তাকে ক্রেতা অসন্তুষ্টি বলে। ক্রেতার প্রাপ্তি যদি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হয় তবে ক্রেতা অতি অনন্দিত হয়। ক্রেতার ব্র্যান্ড সন্তুষ্টি যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে তখন তাকে ব্র্যান্ড লয়্যালটি বলে। ব্র্যান্ড লয়্যালটি ক্রেতার প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে। ক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত মনে করবে পণ্যটি অন্য প্রতিযোগীদেও পণ্যের চেয়ে মানসম্পন্ন ততক্ষণ পর্যন্ত সে পণ্যটি ক্রয় করবে। সাধারণত ক্রেতার বিভিন্ন ধরনের ক্রয় আচরণের মাধ্যমে ব্র্যান্ড আনুগত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। অন্যদিকে ব্র্যান্ড আনুগত্য কেবল মাত্র পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, এটা কোনো সময় কোম্পানিকেন্দ্রিক হয় না। একজন ক্রেতা টাটা ব্র্যান্ডের চা বা লবণ পছন্দ করতে পারে কিন্তু সে টাটা কোম্পানির গাড়ি পছন্দ নাও করতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, গ্রাহকরা যখন সমজাতীয় প্রতিযোগী ব্র্যান্ড থেকে কোনো একটি ব্র্যান্ডকে পছন্দ করে এবং সেই ব্র্যান্ডটি নিয়মিত ক্রয় করে যেখানে প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের পরিসেবা একই রকম থাকে তখন সে অবস্থাকে ব্র্যান্ড আনুগত্য বা ব্র্যান্ড লয়্যালটি বলে।

ব্র্যান্ড লয়্যালটি ও গ্রাহকের লয়্যালটি

Brand Loyalty and Customer Loyalty

এই দুইটি লয়্যালটি দেখতে এবং শুনতে একই রকম মনে হয়। অনেক বিপণন বিশেষজ্ঞগণ এই দুটো ধারণাকে এক বলে থাকে এবং এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতে চান না। তবে এই দুটো লয়্যালটির মধ্যে ধারণাগত কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ব্র্যান্ড লয়্যালটি এবং গ্রাহকের লয়্যালটির মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ব্র্যান্ড লয়্যালটি (Brand Loyalty)

ব্র্যান্ড লয়্যালটি হলো যখন গ্রাহকগণ একই ব্র্যান্ড থেকে বারবার ক্রয় করতে থাকে। তারা নিজে পণ্য ক্রয় করে এবং অন্যকে পণ্য ক্রয় করতে আকর্ষিত করে। এখানে প্রতিযোগী ব্র্যান্ড একই ধরনের সেবা বা সুবিধাসমূহ প্রদান করলেও গ্রাহক সেটাকে উপেক্ষা করে নিজের পছন্দের ব্র্যান্ডটি ক্রয় করে। গ্রাহকগণ মনে করে তাদের ব্র্যান্ডটি বাজারে সবচেয়ে উন্নত ব্র্যান্ড। সে কারণে ব্র্যান্ড লয়্যালটির ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠাত ব্র্যান্ডের ইমেজ ও পণ্য মানের উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।

গ্রাহক লয়্যালটি (Customer Loyalty)

একটি প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকের মধ্যে চলমান মানসিক সম্পর্ক হলো গ্রাহক লয়্যালটি। একজন গ্রাহক প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কী ধরনের আচরণ করে থাকে সেটা হলো গ্রাহকের লয়্যালটি। এখানে গ্রাহক তার বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পণ্য ক্রয় এবং পণ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। গ্রাহকগণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে মূল্যের উপর। গ্রাহকগণ কম মূল্যের পণ্যের প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। উপরের আলোচনা থেকে ব্র্যান্ড লয়্যালটি এবং গ্রাহক লয়্যালটির একটা ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নের ছকের মাধ্যমে এই দুটো লয়্যালটির পার্থক্য দেখানো হলো:

ব্র্যান্ড লয়্যালটি	গ্রাহক লয়্যালটি
ব্র্যান্ড লয়্যালটি হলো একটি প্রত্যক্ষণভিত্তিক বিষয়। এখানে পণ্যের গুণাগুণ ও ইমেজের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।	গ্রাহক লয়্যালটি একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়। এখানে ক্রেতার বিশ্বাস ও আস্থার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।
ব্র্যান্ড লয়্যালটিতে পণ্যের মূল্য বিবেচ্য বিষয় নয়। মূল্য ব্র্যান্ড নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে না।	গ্রাহক লয়্যালটিতে মূল্য হলো প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মূল্য ব্র্যান্ড নির্বাচনে ভীষণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।
এখানে পণ্যের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হয় এবং একই পণ্য বারবার ক্রয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।	এখানে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
এখানে প্রতিষ্ঠান উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্য ও উচ্চ মানসম্পন্ন সেবা অফার করে থাকে।	এখানে প্রতিষ্ঠান বিশেষ মূল্যহ্রাস ও বিশেষ সুবিধাসমূহ অফার করে থাকে।
ব্র্যান্ড লয়্যালটিতে ক্রেতাদের ধরে রাখা এবং নিয়মিত ক্রেতায় পরিণত করা সহজ হয়।	গ্রাহক লয়্যালটিতে ক্রেতাদের ধরে রাখা এবং নিয়মিত ক্রেতায় পরিণত করা কঠিন।
এখানে ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ কম হয়ে থাকে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ বেশি হয়।	এখানে ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ কম হয়।
ব্র্যান্ড লয়্যালটি ক্রেতাদের আবেগ, অনুভূতি, মনোভাব ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়।	গ্রাহক লয়্যালটি ক্রেতাদের খরচের পরিসীমা এবং বাজেট দ্বারা প্রভাবিত হয়।
এখানে প্রতিযোগীদের চেয়ে উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ করা হয়। এখানে পণ্য মান নিশ্চিত হয়ে ক্রেতারা পণ্য ক্রয় করে।	এখানে প্রতিযোগীদের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। এখানে তুলনামূলক মূল্য বিবেচনা করে ক্রেতারা পণ্য ক্রয় করে।
ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে।	গ্রাহক লয়্যালটি সৃষ্টি হয় চরম গ্রাহক সন্তুষ্টির মাধ্যমে।
এখানে কার্যপরিধি হলো ব্র্যান্ড ইমেজ সৃষ্টি ও ব্র্যান্ডের ভাবমূর্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত।	এখানে কার্যপরিধি হলো বিভিন্ন ধরনের প্রসার কৌশল সংক্রান্ত।

ব্র্যান্ড লয়্যালটি প্রকারভেদ (Types of Brand Loyalty)

ক্রেতাগণ বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড ব্যবহার করে এবং তাদের মনের মধ্যে ব্র্যান্ডের একটা ইমেজ তৈরি করে। ক্রেতাদের মনের মধ্যে ইমেজ একদিনে তৈরি হয় না। একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রেতাদের ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি হয়ে থাকে। পণ্য ব্যবহারের

পর যদি ক্রেতাগণ সন্তুষ্টি লাভ করে তবে পুণরায় পণ্যটি ক্রয় করে এবং বারবার ক্রয় করে এক সময় সে নিয়মিত ক্রেতায় পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ক্রেতার ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি হয়। বাস্তবে বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড লয়্যালটি দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ব্র্যান্ড লয়্যালটির বিবরণ দেয়া হলো।

১. হার্ড-কোর লয়্যালটি (Hard-core Loyalty): এখানে সকল ক্রেতা একচেটিয়াভাবে পণ্য বা ব্র্যান্ডটি ক্রয় করে। এরা পণ্যটি বার বার ক্রয় করে। অন্য ব্র্যান্ড বিশ্লেষণ না করে সরাসরি ব্র্যান্ডটি ক্রয় করে। একজন ক্রেতা যখন দোকানে সরাসরি বলে আমার একটা লাক্স সাবানের প্রয়োজন তখন সেই ক্রেতাকে বলা হবে লাক্সা সাবানের হার্ড-কোর লয়্যাল ক্রেতা। এরা নিজে পণ্য ক্রয় করে এবং অন্যকেও পণ্যটি ক্রয় করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। এরা ব্র্যান্ডের প্রতি সর্বদা তাদের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। এরা ইনোভেটিভ ক্রেতা হিসেবে পরিচিত লাভ করে এবং অন্য কোনো বিকল্প ব্র্যান্ড ক্রয় থেকে বিরত থাকে।

২. ইসপ্লিট লয়্যালটি (Split Loyalty): এখানে গ্রাহকগণ একের অধিক ব্যান্ড পছন্দ করে তবে এটা দুইটি বা তিনটি ব্র্যান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই শ্রেণির ব্র্যান্ড লয়্যাল ক্রেতারা যে কোনো কোম্পানির পছন্দের তালিকায় থাকে। এই শ্রেণির ক্রেতাদের যে কোনো সময় হার্ড-কোর ব্র্যান্ড লয়্যালে পরিণত করা যায়। একটি উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে তিনটি বিমান সংস্থার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যা একজন গ্রাহকের পছন্দের তালিকাতে রয়েছে। যেমন— আমেরিকান এয়ারলাইনস, ইউনাইটেড এয়ারলাইনস এবং ডেল্টা এয়ারলাইনস। একজন গ্রাহকের আমেরিকান এয়ারলাইনস ভ্রমনের ভাল অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এটি তার পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে। একই সাথে ডেলট এয়ারলাইন্সে-এর প্রতি তার ইতিবাচক ধারণা রয়েছে এবং এটি তার পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আবার ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সকে সে অপছন্দ করে না যা তার পছন্দের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই শ্রেণির ব্র্যান্ড লয়্যালটিতে প্রথম পছন্দ নিয়ে গ্রাহক উচ্ছাস প্রকাশ করলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয়টি নিয়ে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এই শ্রেণির ক্রেতাদের কোম্পানি টার্গেট করে কারণ এদের পিছনে সময় ব্যয় ও বিনিয়োগ করলে তাদের হার্ড-কোর ব্র্যান্ড লয়্যালটিতে রূপান্তর করার সুযোগ রয়েছে।

৩. শিফট লয়্যালটি (Shift Loyalty): এটি হলো হার্ড-কোর ব্র্যান্ড লয়্যালটি এবং ইসপ্লিট ব্র্যান্ড লয়্যালটির একটি মিশ্রণ ও সুষ্ঠু সমন্বয়। এদের প্রথমে একটি ব্র্যান্ডের প্রতি আনুগত্য থাকে এবং সেখানে তারা হার্ড-কোর ব্র্যান্ড লয়্যালটির মত ভূমিকা পালন করে। কিছুদিন পরে তারা ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে এবং সেই ব্র্যান্ডটি তাদের কাছে হার্ড-কোর ব্র্যান্ড লয়্যালটিতে পরিণত হয়। এটা কিছুদিন ব্যবহার করার পর গ্রাহক আবার ব্র্যান্ডটি পরিবর্তন করতে পারে এবং আবার তৃতীয় অন্য কোনো ব্র্যান্ড ব্যবহার করতে পারে। সাধারণত পণ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এই ধরনের ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমরা সারা বছর ধরে একই ব্র্যান্ডের বিস্কুট, চকলেট, চানাচুর, আইসক্রিম ব্যবহার করি না। এই ব্র্যান্ডগুলো আমরা বারবার পরিবর্তন করে থাকি। ইসপ্লিট ব্র্যান্ড লয়্যালটির সাথে এর পার্থক্য হলো যে, ইসপ্লিটে দুই বা তিনটি পছন্দের ব্র্যান্ড থাকে কিন্তু শিফট লয়্যালটিতে অনেকগুলো পছন্দের ব্র্যান্ড থাকে।

৪. সুইচিং (Switching): এটি প্রকৃতপক্ষে কোনো ধরনের ব্র্যান্ড লয়্যালটি নয়। এই শ্রেণির ক্রেতাদের কোনো ধরনের পছন্দের ব্র্যান্ড থাকে না। এদের নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের কোনো লিস্ট থাকে না। এরা প্রতিনিয়তই তাদের ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে। নতুন কোনো ব্র্যান্ড বাজারে আসলে তারা পূর্বের ব্যবহৃত ব্র্যান্ডটি পরিবর্তন করে নতুনটি গ্রহণ করে। আবার পণ্য ক্রয়ের শেষ মুমূর্তে তারা তাদের ব্র্যান্ড সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে থাকে। যেমন— একজন ক্রেতা একটি আইফোন ক্রয় করার কিছুদিন পর পরবর্তী ফোন ক্রয়ের সময় এন্ড্রয়েড ফোন ক্রয় করল। এই শ্রেণির ক্রেতারা সর্বদাই নতুন পণ্য ক্রয় করতে পছন্দ করে। এরা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ করতে পছন্দ করে এবং এদের আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হয়ে থাকে। এ সকল ক্রেতারা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এদের জন্য সঠিক কোনো কৌশলও প্রণয়ন করা যায় না। তবে এদের ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিক বিক্রয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্র্যান্ড লয়্যালটির গুরুত্ব (Importance of Brand Loyalty)

ব্র্যান্ড লয়্যালটি বিপণনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন বিপণনকারীর প্রধান কাজ হলো এমন কিছু ক্রেতা তৈরি করা যারা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদতি পণ্য বারবার বা নিয়মিত ক্রয় করবে। ক্রেতাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে। সন্তুষ্ট ক্রেতারাই ব্র্যান্ডের খ্যাতি বাড়ায় যা ব্র্যান্ড লয়্যালটির সৃষ্টি করে। ব্র্যান্ড লয়্যালটি থেকে বিপণন ব্যবস্থা বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। নিম্নে ব্র্যান্ড লয়্যালটির গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

১. বিক্রয় বৃদ্ধি (Increase Sales): ছোট বা বড় যে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিক্রয় বৃদ্ধি করা তথা বাজার বৃদ্ধি করা। বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা। ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণে নতুন গ্রাহক বারবার পণ্য ক্রয় করে। একজন ক্রেতা যখন বারবার পণ্য ক্রয় করে তখন পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়, পণ্যের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ব্র্যান্ড লয়্যালটি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে পণ্য বিক্রয়ের একটি ফ্রেম নির্ধারণে সহায়তা করে।

২. ক্রেতা সৃষ্টি (Customer Creation): ব্র্যান্ড লয়্যালটির বড় স্বার্থকতা হলো এর মাধ্যমে পুনঃক্রেতাদের নিয়মিত ক্রেতায় পরিণত করা। নিয়মিত ক্রেতাগণ নিজে নিয়মিত পণ্য ক্রয় করে এবং অন্যদের পণ্য ক্রয় করতে উৎসাহিত করে। অনেক সময় এরা নিজের পকেটের অর্থ খরচ করে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের পণ্য ক্রয়ের পরামর্শ প্রদান করে। এতে নিয়মিত ক্রেতার পাশাপাশি আরো অনেক পুনঃক্রেতার সৃষ্টি হয়। এই পুনঃক্রেতাগণ আবার কিছু নতুন ক্রেতার সৃষ্টি করে। সার্বিকভাবে ব্র্যান্ড লয়্যালটি নতুন ক্রেতা সৃষ্টিতে অনেক বড় ভূমিকা রাখে।

৩. ক্রেতা ধরে রাখা (Customer Retention): বিপণনে একটা কথা আছে নতুন গ্রাহক সৃষ্টির চেয়ে বর্তমান গ্রাহক ধরে রাখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আসলে বিভিন্ন ধরনের বিপণন কৌশলের মাধ্যমে নতুন ক্রেতা তৈরি করা যায়। কিন্তু এই নতুন ক্রেতাদের যদি ধরে রাখা না যায় বা এদের যদি নিয়মিত ক্রেতায় পরিণত না করা যায় তবে প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জন করতে পারে না। সাধারণত ব্র্যান্ড লয়্যালটিতে ক্রেতাগণ নিজের পছন্দের ব্র্যান্ডের বাইরে অন্য ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয় করতে চায় না এবং প্রতিযোগীদের পণ্যসমূহ ক্রয়ে আগ্রহী হয় না। ফলে ব্র্যান্ড লয়্যালটি ক্রেতাদের স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করে।

৪. বিপণন খরচ হ্রাস (Reducing Marketing Costs): ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণে বিপণন খরচ লক্ষণীয়ভাবে কম হয়। বিপণনে বিভিন্ন ধরনের খরচ থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় খরচ হলো সমন্বিত বিপণন যোগাযোগ খরচ। ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণে ক্রেতাদের ব্র্যান্ডের সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রচার অভিযানের জন্য অনেক বড় বাজেট নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া বিপণন মোটিভেশনাল অভিযানের জন্য প্রতিষ্ঠানকে যে বড় অংক খরচ করতে হয় ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণে সেটার পরিমাণ অনেক কম হয়। সার্বিকভাবে ব্র্যান্ড লয়্যালটি বিপণন খরচকে অনেকাংশে হ্রাস করতে সাহায্য করে।

৫. কম মনোযোগ (Less Attention): ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণে ক্রেতাদের পিছনে বেশি সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হয় না। ব্র্যান্ড লয়্যালটিতে ক্রেতা হলো নিয়মিত ক্রেতা। এরা পণ্যের কোনো ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে না এবং পণ্যের সার্বিক দিক সম্পর্কে তাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকে। এদের মনে একটা বিষয় সর্বদা কাজ করে যে, ব্র্যান্ডের পণ্য মানেই গুণগতমানে সেরা। ক্রেতা সৃষ্টি ও ক্রেতা ধরে রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানকে যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হয় তা ব্র্যান্ড লয়্যালটির জন্য প্রয়োজন হয় না। ফলে ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণে একটি প্রতিষ্ঠান ক্রেতাদের দিকে কম সময় দিয়ে বিপণনের অন্য দিকে বেশি সময় দিতে পারে।

৬. ওয়ার্ড অফ মাউথ (Word of Mouth): একটি প্রতিষ্ঠান যে কোনো উপায়ে পণ্য বিপণন করুক না কেন পণ্যকে শেষ পর্যন্ত মানুষের ওয়ার্ড অফ মাউথে পরিণত করতে হবে। কারণ বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিপণনের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ওয়ার্ড অফ মাউথ। পৃথিবীতে যে কোনো পণ্য সফলতার পিছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এই মাধ্যমটি। অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক খরচ করেও ওয়ার্ড অফ মাউথের সুবিধা নিতে পারছে না। যে কোনো একটি বিষয়ে একজন ব্যক্তি থেকে অন্য একজন ব্যক্তির কাছে অবাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পৌঁছে যাওয়াকে বলে ওয়ার্ড অফ মাউথ। অনেক পদ্ধতির মাধ্যমে ওয়ার্ড অফ মাউথ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে তবে ব্র্যান্ড লয়্যালটির মাধ্যমে ইতিবাচক ওয়ার্ড অফ মাউথ সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়ে।

৭. আপোষমূলক মনোভাব (Compromising Attitude): ব্র্যান্ড লয়্যালটির ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সবসময় আপোষমূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় কোম্পানি পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে কোনো কারণে নিয়মিত সেবা দানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ রকম অবস্থায় গ্রাহকগণ তাদের আপোষমূলক মনোভাব ব্যক্ত করে। আবার পণ্য নিয়মিত সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ হলে বা যথাযথ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারলে ব্র্যান্ড লয়্যালটির জন্য ক্রেতাগণ এটাকে উপেক্ষা করে। তাছাড়াও অন্যান্য ভুল ত্রুটিকে এরা এড়িয়ে যায়। ব্র্যান্ড লয়্যালটির প্রভাবে ক্রেতাগণ কোম্পানির সমস্যাসমূহকে কোনো সময় বড় করে দেখে না। কোম্পানি তথা তাদের ব্র্যান্ডের প্রতি গ্রাহকগণ সর্বদাই ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে।

ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণ

Factors of Brand Loyalty

যে কোনো প্রতিযোগির চেয়ে উচ্চ মানের পণ্য এবং সেবা উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে ক্রেতা যখন একটি ব্র্যান্ড বারবার ক্রয় করে তখন তাকে ব্র্যান্ড আনুগত্য বা ব্র্যান্ড লয়্যালটি বলে। অনেক সময় মনে করা হয়ে থাকে মূল্যের কারণেই ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি হয়ে থাকে। আসলে সেটা ঠিক নয়, ব্র্যান্ড লয়্যালটি একজন ক্রেতার মানসিক উপলব্ধির বিষয়। ব্র্যান্ড লয়্যালটির প্রধান তিনটি বিষয় হলো— ব্র্যান্ড সম্পর্কে ক্রেতার অনুভূতি, ব্র্যান্ডের গুণগতমান এবং ব্র্যান্ডের প্রতি ক্রেতার বিশ্বাস। একদিনে ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি হয় না, বিভিন্ন কারণে ব্র্যান্ড লয়্যালটির সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিম্নে ব্র্যান্ড লয়্যালটির উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ বর্ণনা করা হলো:

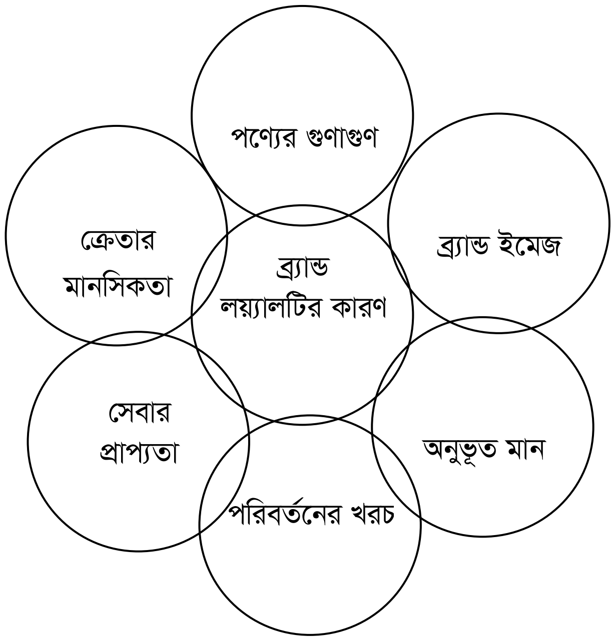

চিত্র ১.১ ব্র্যান্ড লয়্যালটির প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

১। পণ্য মান (Product Quality): ব্র্যান্ড লয়্যালটির প্রধান কারণ হলো পণ্য মান। একটি প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় প্রচার তার পণ্যের মান। রুচিশীল ও টেকসই পণ্য হলে ক্রেতা বাড়বে। এভাবেই বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য মানকে সামনে রেখেই তাদের বিপণন কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ক্রেতার প্রত্যাশা অনুযায়ী মানসম্মত পণ্য বা সেবা নিশ্চিত করা ও তার ধারবাহিকতা বজায় রাখা। বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান হলতিয়ার হলো পণ্যের মান। পণ্যের মান হলো সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি যা ক্রেতার প্রয়োজন মেটায়, সন্তুষ্টি বিধান করে এবং যার উপযোগিতা ক্রেতার কাছে প্রত্যাশার সমান বা তার চেয়েও বেশি থাকে। ফলে বিপণনকারীকে ব্র্যান্ড লয়্যালটি বৃদ্ধি করতে হলে পণ্যের যথাযথ মানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

২। ব্র্যান্ড ইমেজ (Brand Image): ব্র্যান্ড লয়্যালটি বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির ব্র্যান্ডের একটি শক্তিশালী এবং ইতিবাচক ব্র্যান্ড ইমেজ থাকতে হবে। একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের প্রতি ক্রেতাদের ধারণা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি হয়। ব্র্যান্ডের লোগো, নাম, প্রতীক, ডিজাইন শ্লোগান ইত্যাদির মাধ্যমে একটি ব্র্যান্ড প্রতিযোগীদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে। ক্রেতারা ব্র্যান্ডের এ সকল উপাদানগুলো কীভাবে মূল্যায়ণ করছে তার উপর ভিত্তি করেই ব্র্যান্ড ইমেজ গঠিত হয়। একটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বাজারে সফলতা লাভ করছে না কারণ বাজারে বিকল্প আর একটি ব্র্যান্ড তার ইমেজ সৃষ্টি করতে পেরেছে। শক্তিশালী ব্র্যান্ড ইমেজ ক্রেতাদের ধরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ব্র্যান্ড লয়্যালটির সৃষ্টি করে।

৩। অনুভূত মান (Perceived Value): একজন ক্রেতা কীভাবে পণ্যের সুবিধা এবং মূল্যকে বিবেচনা করে তাকে অনুভূত মান বলে। এখানে ক্রেতারা তাদের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির তুলনা করে থাকে। যদি ক্রেতাদের প্রাপ্তি এবং প্রত্যাশা সমান হয়

তবে ক্রেতারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, যদি প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি বেশি হয় ক্রেতারা মহাখুশি থাকে এবং প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি কম হয় তবে ক্রেতারা অসন্তুষ্ট হয়। কোন ব্র্যান্ডের অনুভূত মান বেশি হলে তা ক্রেতা আকর্ষণ বৃদ্ধি তথা ব্র্যান্ড লয়্যালটি বৃদ্ধি করবে। ক্রেতারা অনুভূত মানের উপর ভিত্তি করে পণ্য ক্রয় করে থাকে। অনুভূত মান কম হলে গ্রাহকগণ অন্য কোথাও আরো সন্তোষজনক পণ্যের সন্ধান করবে। গ্রাহকগণ এটাকে অনেক সময় অনুভূত মূল্য বলে বিবেচনা করে। গ্রাহকগণ ব্র্যান্ডটা কতটা মূল্যবান মনে করে তার উপর ভিত্তি করে পণ্য ক্রয় করে।

৪। সুইচিং খরচ (Switching Cost): পণ্য, ব্র্যান্ড ও সরবরাহকারী পরিবর্তনের ফলে একজন ক্রেতার যে খরচ হয় তাকে সুইচিং খরচ বলে। সুইচিং খরচ যদি খুব বেশি হয় তবে ব্র্যান্ড লয়্যালটি বৃদ্ধি পায়। যদিও বেশির ভাগ প্রচলিত সুইচিং খরচগুলো আর্থিক প্রকৃতির হয়ে থাকে তথাপি সময় ভিত্তিক, প্রচেষ্টা ভিত্তিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিক সুইচিং খরচ দেখা যায়। ক্রেতা যদি তার কম্পিউটার বাদ দিয়ে নতুন কম্পিউটার ক্রয় করতে যায় তখন এর মাদার বোর্ড বা প্রসেসর পরিবর্তনের খরচ অনেক বেশি পড়বে। আবার ব্যাংক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বাতিল করার জন্য অনেক খরচ ও ঝামেলা পোহাতে হয়। এভাবে বিভিন্ন পণ্য, সেবা বা ব্র্যান্ড পরিবর্তনের ফলে যদি সুইচিং খরচ অনেক বেশি হয় তবে ক্রেতাগণ প্রতিযোগী ব্যান্ডকে বিবেচনা না করেই বর্তমান ব্র্যান্ডটি ব্যবহার করতে থাকে।

৫। সহজলভ্যতা ও সেবা (Availability and Service): বাজারে পণ্যটি সহজলভ্য ও বিস্তৃত পণ্য সেবা প্রদান করলে ব্র্যান্ড লয়্যালটি বৃদ্ধি পায়। কোনো ব্র্যান্ড যদি প্রয়োজনের সময় পাওয়া না যায় তবে ব্র্যান্ডটির লয়্যালটি কমতে থাকে। অনেক জনপ্রিয় ব্র্যান্ড তাদের পণ্য বাজারে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সরবরাহ করতে না পারায় ক্রেতা হারাতে হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠিত স্টোর ক্রেতা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে পণ্য সঠিকভাবে সরবরাহ করতে না পেরে। যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়োত্তর সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে ক্ষেত্রে যথাযথ বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান না করতে পারলে ব্র্যান্ড লয়্যালটি হ্রাস পেতে থাকে। একটা ভালো ব্র্যান্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এর সময়মত সরবরাহ ও বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। ক্রেতার মানসিকতা (Customer Psychology): অনেক সময় ক্রেতার মানসিকতা ও মনোভাব দ্বারা ব্র্যান্ড লয়্যালটি প্রভাবিত হয়। একটি পণ্যের গুণাগুণ, প্রকৃতি বা পণ্য সেবা বিবেচনা না করেই অনেক ক্রেতা ব্র্যান্ড পরিবর্তন করতে পারে। আবার কোনো কারণ ছাড়াই একজন ক্রেতা পণ্য পরিবর্তন করতে পারে। কিছু ক্রেতা ঘন ঘন ব্র্যান্ড পরিবর্তন করতে পছন্দ করে। এ সকল ক্রেতাদের সহজেই ব্র্যান্ড লয়্যালটি তৈরি হয় না। আবার অনেক ক্রেতা বাজারে প্রতিযোগী উচ্চ গুণসম্পন্ন পণ্য গ্রহণ না করে পুরাতন ব্র্যান্ডটি ব্যবহার করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভালো পণ্য ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের পণ্য ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি করে থাকে।

সারসংক্ষেপ:

ক্রেতারা যখন কোনো সমজাতীয় প্রতিযোগী ব্র্যান্ড থেকে কোনো একটি ব্র্যান্ডকে পছন্দ করে এবং সেই ব্র্যান্ডটি নিয়মিত ক্রয় করে সেখানে প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের পরিসেবা একই রকম থাকে তখন সে অবস্থাকে ব্র্যান্ড লয়্যালটি বা ব্র্যান্ড আনুগত্য বলে। একটি প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকের মধ্যে একটি চলমান মানসিক সম্পর্ক হলো গ্রাহকের লয়্যালটি। একজন গ্রাহক নিয়মিত পণ্য ক্রয় ও ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই ব্র্যান্ডের অনুগত ক্রেতায় পরিণত হয়। ব্র্যান্ড লয়্যালটিতে পণ্যের মূল্য কোনো বিবেচ্য বিষয় না হলেও গ্রাহক লয়্যালটিতে মূল্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিপণনে বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড লয়্যালটি দেখা যায়। হার্ড-কোর লয়্যালটিতে গ্রাহকগণ একচেটিয়া ভাবে ব্র্যান্ডটি ব্যবহার করে। ইসপ্লিট লয়্যালটিতে গ্রাহকদের দুই-তিনটি পছন্দের ব্র্যান্ড থাকে। শিফট লয়্যালটিতে গ্রাহকদের অনেকগুলো পছন্দের ব্র্যান্ড থাকে। সুইচিং লয়্যালটিতে গ্রাহকদের নির্দিষ্ট কোনো পছন্দের ব্র্যান্ড থাকে না। ব্র্যান্ড লয়্যালটি বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্র্যান্ড লয়্যালটির কারণে একটা প্রতিষ্ঠান যে সকল সুবিধা লাভ করে তা হলো— প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বৃদ্ধি, নতুন নতুন ক্রেতার সৃষ্টি, বর্তমান ক্রেতাদের ধরে রাখা সহজ হয়, বিপণন খরচ তুলনামূকভাবে অনেক কম হয়, ক্রেতাদের দিকে কম মনোযোগ দিতে হয়, ইতিবাচক ওয়ার্ড অফ মাউথ তৈরি হয়, ক্রেতাদের আপোষমূলক মনোভাব সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। একদিনে ব্র্যান্ড লয়্যালটি সৃষ্টি হয় না, বিভিন্ন কারণে ব্র্যান্ড লয়্যালটির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্র্যান্ড লয়্যালটির উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ হলো— পণ্য মান, ব্র্যান্ড ইমেজ, অনুভূত মান, সুইচিং খরচ, সহজলভ্যতা ও সেবা, ক্রেতার মানসিকতা ইত্যাদি। বিপণনকারীগণ বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড লয়্যালটির জন্য বিভিন্ন ধরনের বিপণন কৌশল গ্রহণ করে থাকে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. ব্র্যান্ড কী? ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
২. ব্র্যান্ড ও ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৩. ব্র্যান্ড সম্পর্কিত ধারণাসমূহের বিবরণ দিন?
৪. ট্রেডমার্ক ও ব্র্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৫. পণ্য ও ব্র্যান্ডের মধ্যে পার্থক নির্ণয় করুন।
৬. পণ্যের স্তরসমূহ উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন।
৭. ব্র্যান্ড নামের ধরনসমূহের বিবরণ দিন।
৮. ব্র্যান্ডের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৯. ব্র্যান্ডের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
১০. ভোক্তা ও সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
১১. বিপণনকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
১২. ব্র্যান্ডিংয়ের সীমাবদ্ধতাসমূহ বর্ণনা করুন।
১৩. ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা বলকে কী বোঝায়?
১৪. ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার পরিধি ব্যাখ্যা করুন।
১৫. ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির বিবরণ দিন।
১৬. বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
১৭. ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
১৮. ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের বিবরণ দিন।
১৯. ব্র্যান্ড বিপণন মিশ্রণ কী? কীভাবে ব্র্যান্ড বিপণন মিশ্রণ ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা আলোচনা করুন।
২০. ব্র্যান্ডের উপাদানসমূহের বিবরণ দিন। কীভাবে ব্র্যান্ড উপাদান ব্র্যান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা ব্যাখ্যা করুন।
২১. "সবকিছু কী ব্র্যান্ড করা যায়"— উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।
২২. "সবকিছু কী ব্র্যান্ড করা উচিত"— উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।
২৩. ব্র্যান্ডিংয়ের আওতা ও পরিসীমা বর্ণনা করুন।
২৪. ব্র্যান্ড লয়্যালটি কী? ব্র্যান্ড লয়্যালটি ও গ্রাহক লয়্যালটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২৫. ব্র্যান্ড লয়্যালটির প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করুন।
২৬. ব্র্যান্ড লয়্যালটির গুরুত্বসমূহ আলোচনা করুন।

তথ্যসূত্র:

১. Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, 5th Edition, Pearson India Education Services, Uttar Pradesh, India, 2022.

২. Philip Kotler and Kevin L. Keller, Marketing Management, 14th Edition, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 2012.

৩. David A. Aaker, Brand Relevance, 3rd Edition, John Willey & Sons, Sussex, UK, 2011.

৪. Susan Chritton, Personal Branding, 2nd Edition, John Willey & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2014.

৫. Alina Wheeler, Designing Brand Identity, 3rd Edition, John Willey & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2009.

৬. Drake Baer, Timeless Branding Lession From A Young Steve Jobs, First Company, August 12, 2013, https//www.fastcompany.com.

৭. Thomas J. Madden, Brand Matters: An Emprical Demonestration of the Creation of Sharehulder Value Through Brands, Journal of Academy of Marketing Science, Vol. 30, No. 2, 2006.

৮. David Tayloy and David Nichols, The Brand Gym, 2nd Edition, West Sussex, John Willey & Sons, 2010.

৯. Juliet Carnoy, The Rise of the Digitality Native Vertical, The Huffington Post, Feb. 2017, www.huffingtonpost.com.

১০. William J. Stanton, Marketing Concepts and Cases, Special Indian Edition, The McGrow Hill Company, New Delhi, 2006.

১১. William L. Wilkie, Consumer Behavior, 3rd Edition, John Willey & Sons, Hoboken, New Jersey, 1994.

১২. মোহাম্মদ আবদুল হাই, ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, বিশাল বুকস্ কমপ্লেক্স, বাংলবাজার ঢাকা-১১০০, ২০১৭।

১৩. মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার ও মোঃ মঞ্জুরুল আলম, মার্কেটিং প্রমোশন, কাজী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০৩।